সময়ের দাবী

মহারাণী শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

প্রকাশক—
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড,
কলিকাতা

আশ্বিন ১৩৪৭
মূল্য এক টাকা

মুদ্রাপক—
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি. এ.
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

স্বর্গীয় মহারাজা ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় (নদীয়া)

শরতের বাঁশী বাজে মৃদুমন্দ ধরণীর দ্বারে,
আমার ভুবনে তোলে বিষণ্ণ মূর্চ্ছনা বারেবারে !
কাঁদে হেথা আকাঙ্ক্ষিত মিলনের বাসর সদাই—
তোমারি সযত্নে রচা' ! নাই নাই তুমি শুধু নাই ।
সংসারের নিত্য কাজে তুমি কি দিবে না সাড়া আজি ?
কোথায় বসিয়া তুমি ভরিতেছ আনন্দের সাজি !

এখানে যে শূন্য কক্ষে তোমারে না দেখি রিক্ত হিয়া
উদ্দেশে তোমারি প্রিয় পুষ্পদল দিই ছড়াইয়া।
রেখে গেছ স্মৃতিটুকু বসাইয়া ধ্যানের আসনে
নীরব সঙ্গীতে তাঁরে আরাধিয়া রাখি সঙ্গোপনে।
মনে পড়ে—নির্জ্জন নিশীথে কত বসন্ত-সন্ধ্যায়,
জ্যোৎস্নার চন্দন-আঁকা কত শুক্ল রাতের সভায়,
কত হাসি-আলাপনে উচ্ছলিত স্নেহ-সুধা-ধার,
বহাইতে জনে জনে আনন্দের হিল্লোল তোমার।
আজিও রয়েছে লেখা সুখে দুঃখে কত বেদনায়,
রেখে গেছ মঙ্গল-বারতা তব অন্তর-গাথায়।
সত্য ছিল বীর্য্য তব, করুণ কোমল তব প্রাণ,
আদর্শ চালিত গতি, অন্যায়েরে দিতে নাকো ত্রাণ।
সকলি অর্পণ করি জীবনের নব অভিযানে
অকুণ্ঠিত গেলে চলি, বুঝি কোন্ অমৃত সন্ধানে।
চিন্ময় বন্ধনে তুমি বেঁধে গেছ চিরন্তন ডোরে,—
দিনে দিনে নানা দানে দিয়ে গেলে পাথেয় যে মোরে
রহিয়া নন্দন-লোকে রচো সেই নব ছন্দে গানে—
অশ্রুসাথে মিলিত সে সুমধুর বাজে মোর কানে,—
সে সুর-প্রসাদ যেন করে ধন্য বাণী-অর্ঘ্য মম,
ওগো জীবনের কবি, হে আমার আনন্দ উত্তম!
হে অমর্ত্ত্য-পুরবাসী, করি পুণ্য স্মৃতি অভ্যর্থনা,
তুলে নাও কৃপা ক'রে নিবেদিত ক্ষুদ্র এ-অর্চ্চনা।

কৃষ্ণনগর
আশ্বিন, ১৩৪৭

ভূমিকা

কৃষ্ণনগরের মহারাণী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী 'মায়ের দান' নাম দিয়া একখানি ছোট উপন্যাস প্রকাশ করিতেছেন। বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে এই তাঁহার প্রথম অভিযান। তাঁহার ইচ্ছা ঐ গ্রন্থের আমি একটি ভূমিকা লিখিয়া দিই। মহারাণীর অনুরোধ আমি উপেক্ষা করিতে পারি নাই।

মহারাণীর স্বর্গগত পিতৃদেব রাজা আশুতোষ নাথ রায়ের সহিত আমার পরিচয় ছিল। অনেক বৎসর পূর্ব্বে (মহারাণীর তখন শৈশব) বহরমপুরে আমি একবার রাজা বাহাদুরের ম্যানেজার সাতকড়ি বাবুর অতিথি হইয়াছিলাম। তদুপলক্ষে রাজা আশুতোষ রায়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয়। মহারাণীর স্বামী মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়ের সহিতও আমার পরিচয় ছিল। মহারাজা যখন বাংলার গভর্ণরের মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত ছিলেন, সে সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও বঙ্গদেশস্থ শিক্ষা-পরিষদের পক্ষ হইয়া কয়েকবার মহারাজের সহিত মিলিত হইতে হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগর রাজবংশের সহিত বাংলা সাহিত্যের বরাবরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে 'রায় গুণাকর' ভারতচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত এবং যে 'অন্নদা-মঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' সে যুগের বঙ্গ-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট অবদান—তাহা ভ্রূণেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইত। কিন্তু সাহিত্যিকরূপে ঐ রাজবংশের কাহারও আত্ম-প্রকাশ বোধ হয় 'মায়ের দান' গ্রন্থকর্ত্রীরই প্রথম।

'মায়ের দান' আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। এ উপন্যাসের উদ্দেশ্য প্রাচীন বনিয়াদী বংশের একটি সংসার-নাট্যের যবনিকা উত্তোলন করিয়া সে যুগের বাঙ্গালী সমাজের চিত্র প্রদর্শন। মহারাণীর এ প্রচেষ্টা বিফল হয় নাই।

মালদহ জেলার সোনাপুর গ্রামের এক সময়ে বর্দ্ধিষ্ণু মুখুজ্জে বংশের শেষ দুইটী স্তিমিত প্রদীপ দুইটী নাবালক ভাই, তাহাদের ভার বিধবা মা রমাসুন্দরীর উপর। মুখুজ্জে বংশের হর্তা-কর্তা বিধাতা পুরাতন 'পাকা' নায়েব শান্তিদয়াল। তিনি নিজের কোলে ঝোল টানিয়া অবস্থা বেশ সচ্ছল ও শাঁসালো করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা অমিয়া। কি কর্ম্মসূত্রে অমিয়া শান্তিদয়ালের কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন—গহণা কর্ম্মণো গতিঃ। তবে প্রহ্লাদ যদি হিরণ্যকশিপুর পুত্র হইতে পারে—তবে অমিয়া শান্তিদয়ালের কন্যা না হইবে কেন?

এই অমিয়া মেয়েটিকে আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। কৈশোর হইতেই তাহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অনুরাগ রমাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রমথের উপর। এই প্রমথ কিন্তু তাহার পিতার প্রধান শত্রু। প্রমথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই কুলক্রমাগত বিক্রম ও দৃঢ়তার সহিত পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধারের জন্য (নিজেরা কপর্দ্দকহীন হইলেও তাহার মাতার বাল্যসখী এক সহৃদয়া মহিলার সাহায্যে) মামলা জুড়িয়া দিল এবং ঐ মামলার ফলে শান্তিদয়ালকে নানাভাবে পর্য্যুদস্ত ও নিগৃহীত করিল। এই মামলার কথা লইয়া গ্রন্থকর্ত্রী উপন্যাসের অনেক পৃষ্ঠা ব্যয়িত করিয়াছেন। আমার মনে হয় গ্রন্থকর্ত্রীর নাবালক শিশুপুত্রের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহাকে যে সকল বিবিধ মামলায় জড়িত হইতে হইয়াছে—ইহা তাহারই প্রতিচ্ছবি।

বৈষ্ণব মহাজন বলিয়াছেন—অহোরিব গতিঃ প্রেম্নঃ। মামলারও তাই। প্রমথর মামলা কুটিল গতিতে প্রসর্পিত হইতেছে, এমন সময় অমিয়াকে তাহার রুগ্ন মাতাকে লইয়া রিখিয়ায় 'চেঞ্জে' যাইতে হইল এবং তথায় কয়েক মাস অবস্থান করিতে হইল। রিখিয়ায় যাইবার পূর্বে অমিয়ার বিবাহের একটা ভাল সম্বন্ধ আসিল। কিন্তু অমিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া মাকে বলিল—'বিয়ে না চিতায় শয়ন!—আমি কখনও বিয়ে করব না'।

সে যাহা হ'ক মাকে লইয়া 'চেঞ্জে' যাওয়াতে অমিয়া প্রমথর চক্ষুর অন্তরাল হইল। কথায় বলে 'out of sight

out of mind'—অর্থাৎ, গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষায়, 'চোখের আড়ালে ও কাণের ব্যবধানে মানুষ সবই ভুলিয়া যায়'। কিন্তু এ কিশোর-কিশোরীর তাহা হইল কৈ? রিখিয়ায় আমিয়ার 'প্রাণের দৃষ্টি অসীম আকাশের একটি ধ্রুবতারার প্রতি নিরন্তর চাহিয়া' রহিল। সে ধ্রুবতারা প্রমথ। রিখিয়ায় যাইবার সময় প্রমথ অমিয়ার সম্বন্ধ আসিয়াছে জানিয়া তাহার সহিত দেখা করিল না। অদর্শনে উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল অমিয়া "সঙ্গীহারা হরিণীর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে চলিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'নিষ্ঠুর! চোখের দেখাও একবার দিলে না।'

প্রমথ সংযমের বাঁধনে নিজেকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত কিন্তু তথাপি ভাবের বন্যায় তাহার হৃদয়ও সময় সময় ভাসিয়া যাইত। তখন অমিয়ার মুখ তাহার হৃদয়পটে ফুটিয়া উঠিত। গ্রন্থকর্ত্রী বেশ সুকৌশলে এই মিথঃ অনুরাগের ঘাত প্রতিঘাত চিত্রিত করিয়াছেন।

এদিকে প্রমথর মামলাটা প্রায় কিনারায় ভিড়িবার উপক্রম হইল। উভয় পক্ষের উকীলের সওয়াল জবাব শুনিয়া হাকিম এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যে তিনি প্রমথর অনুকূলেই রায় দিবেন। ইহার ফল কিন্তু বড় বিষময় হইল। শান্তিদয়াল ষড়যন্ত্র করিয়া গুণ্ডাদ্বারা প্রমথকে আক্রমণ করাইয়া তাহাকে ভীষণভাবে আহত করিল। প্রমথ কোন ক্রমে প্রাণ বাঁচাইয়া স্থানীয় হাসপাতালে নীত হইলেন

এবং বিশেষ যত্ন ও শুশ্রূষার ফলে ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিলেন।

শান্তিদয়ালের এই খুনী ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইল না। ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা বিচারাধীন করিয়া তাহাকে হাজতে হেপাজত করিলেন। দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় এবং হয়ত নিজকৃত দুষ্কর্মের অনুশোচনায় তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি দেখা দিল।

এই সকল দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া অমিয়া মা'কে লইয়া রিখিয়া হইতে ফিরিতে বাধ্য হইল। রমাসুন্দরী অমিয়া ও তাহার রুগ্না মাতার নিরাশ্রয় অবস্থা দেখিয়া সাদরে তাহাদিগকে নিজের ভিটায় আশ্রয় দিলেন এবং যথোচিত সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু অমিয়ার মাতার মৃত্যুরোগ—তিনি ক্রমশঃই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনের একান্ত বাসনা তিনি চক্ষু বুজিবার আগে অমিয়াকে প্রমথর হাতে সমর্পণ করিয়া যান। কিন্তু সে পক্ষে একটা প্রবল বাধা উপস্থিত হইল। রমাসুন্দরীর বাল্যসখী—যে সহৃদয়া মহিলার আনুকূল্যে প্রমথ মামলার ব্যয় বহন করিতে পারিয়াছিল এবং যিনি প্রমথকে নিজের পালকপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহার গৃহে কতকটা অপ্রত্যাশিতভাবে একটি কুমারী আসিয়া অধিষ্ঠান করিল। তাহার নাম মলিনা। মলিনা অপূর্ব সুন্দরী তাহার উপর বি, এ, পাশ, শিক্ষিতা—বিনীতা, সুচরিত্রা ও ভক্তিমতী।

প্রমথর পালক মাতার জেদ হইল তাহার সহিত প্রমথর বিবাহ দেন। ফলে অমিয়া ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

এইবার আমরা এই জীবন নাটকের শেষ গর্ভাঙ্কে উপনীত হইলাম। অমিয়ার মাতা প্রমথর পৈতৃক ভিটার একটি গৃহে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। এ দৃশ্য বেশ করুণ দৃশ্য। মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে রমাসুন্দরীত আছেনই, অমিয়া ও প্রমথকেও ডাকান হইল। কম্পিত হাতখানা বাড়াইয়া মৃত্যুপথ-যাত্রিনী প্রমথর হাত ধরিবার চেষ্টা করিলেন। প্রমথ বলিল—'আমাকে কিছু বলচেন কাকীমা?' অতিকষ্টে কাকীমা অমিয়ার হাতখানা লইয়া প্রমথর হাতের উপর দিলেন এবং জড়িতকণ্ঠে বলিলেন—"শেষের অনুরোধ—কাকীমার শেষ দান অমিয়াকে তুমি নাও বাবা।" প্রমথ মা'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমাসুন্দরী তাড়াতাড়ি বলিলেন—"ও মায়েরই দান প্রমথ। গ্রহণ কর বাবা।" প্রমথ কাকীমার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া কহিল, "আজ হ'তে সযত্নে গ্রহণ করলুম 'মায়ের দান'।" ইহাই 'মায়ের দান'।

১৩৯ বি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
১০ই আশ্বিন, ১৩৪০

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মায়ের দান

এক

প্রাচীন বনিয়াদী বংশের একটি সংসার নাট্যের যবনিকা উত্তোলন করিলে সে যুগের বাঙ্গালী সমাজের সহিত পরিচয় লাভ হয়।

মালদহ জেলার সোনাপুরা গ্রামের মুখুজ্জে বংশের আর বিশেষ কেহ জীবিত নাই। ঐ বংশের শেষ ছিলেন হরিনারায়ণ; কিন্তু তাঁহার যুবা বয়সের কিছু দুরন্তপনা ছিল, একদা অরণ্যে শিকার করিতে গিয়া তিনিও প্রাণ হারাইলেন। মুখুজ্জে বংশের শেষ দুইটি প্রদীপ—দুইটি নাবালক—কোন মতে টিম টিম করিয়া জ্বলিতে লাগিল। দুইটি বালকের হিতাহিত ও সুখদুঃখের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন তাহাদের জননী রমাসুন্দরী। তখন রমাসুন্দরীর বয়স ত্রিশ অবধি পৌঁছায় নাই।

গল্প পুরাতন, বিষয়বস্তু তাহা অপেক্ষাও পুরাতন; কিন্তু মানব চরিত্রের চিরকালীন বৈচিত্র্য কাহিনী আবার নূতন করিয়া জননী ও সন্তান দুটির শয্যা-শিয়রে নিজেকে প্রকাশ করিতে লাগিল।

সেদিন অপরাহ্ণে ছোট ছেলে মন্মথর সামান্য জ্বরোভাব হওয়ায় রমাসুন্দরী শান্তিদয়ালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নিরুপায় বিধবা স্ত্রীলোকের কাতর আহ্বান তাঁহাদের পুরাতন পাকা নায়েব শান্তিদয়ালের কাণে পৌঁছিতে দেরী হইল; তিনি যখন আসিলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "বৌঠান্, গেলেন কোথায়? আলোটাও কি এতক্ষণ জ্বাল্‌তে নেই? কি যে এ বাড়ীর ব্যবস্থা, জানিনে।"

রমাসুন্দরী বাহির হইয়া আসিলেন। মাথায় ঘোমটা টানিয়া কহিলেন, "আলো জ্বালবার ইচ্ছা থাক্‌লেও ব্যবস্থা যে নেই, একি আপনি খবর রাখেন না?"

শান্তিদয়াল একটু বিজ্ঞের হাসি হাসিলেন। বলিলেন, "বৌঠান্, আপনি মনিবের স্ত্রী, নৈলে এখানে দাঁড়িয়ে বলে যেতুম, মেয়েরা কেবল নিজেদের কোলেই ঝোল টানে। থাক্‌গে ওসব কথা। ছেলেটার জ্বর কি খুব বেশী?"

রমাসুন্দরী কহিলেন, "জ্বর হয়েছে, না হয় সেরেও যাবে; কিন্তু শীতের দিনে বাছাদের গায়ে একখানা লেপ যদি না থাকে, তবে মা হ'য়ে কি করে সহ্য করি?"

তাঁহার ধরা গলা শুনিয়া শান্তিদয়াল একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন। তারপরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঈষৎ তির্য্যক্ হাসি হাসিয়া সহসা বলিলেন, "এও শুন্‌তে হ'ল, মুখুজ্জে বংশের ছেলের গায়ে শীতের একখানা লেপও নেই। কপাল, কপাল, নইলে শেষ কালের তালুকটিও যা' ছিল তাও হয়ত দুই চার দিনের মধ্যে নীলামে উঠ্‌তে পারে। হুঁঃ— আমার হয়েছে যত জ্বালা। চাক্‌রী করতে এলুম মুখুজ্জে বংশে, কিন্তু বেনোজল ঢুকে আমার বেড়া জল টেনে নিয়ে যাচ্ছে।"

কিন্তু একথা যাঁহার উদ্দেশে বলা হইল, শান্তিদয়াল দেখিলেন না, নীলাম শব্দটি শুনিয়া সেই নারী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দুইটি অসহায় বালকের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন।

শান্তিদয়াল কহিলেন, "তা হ'লে কি আমার চাকরটাকে ডাক্তারের বাড়ী পাঠিয়ে দে'ব, বৌঠান্?"

রমাসুন্দরী নিজেকে সামলাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আজ ওষুধ না হলেও চল্‌বে, কিন্তু শীতে গায়ে দেবার একটা কিছু—"

"আচ্ছা, দেখি, আমার ঘরেও আবার—দেখি যদি কিছু একটা পাই"—বলিতে বলিতে শান্তিদয়াল আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইয়া পলাইয়া বাঁচিলেন।

আধ ঘণ্টা পরে একটি কিশোরী মেয়ে এই বাড়ীর পোড়ো দালানের উপর উঠিয়া ডাকিল, "জ্যেঠিমা, এই ঘরে বুঝি ?"

ভিতর হইতে রমাসুন্দরী সাড়া, দিলেন, "কে রে অমিয়া নাকি ? এস মা, এস।"

ভিতরে ঢুকিয়া অমিয়া কহিল, "হরিয়া সঙ্গে এসেছে, আপনার জন্যে একখানা লেপ এনেছি জ্যেঠিমা। মনুর কখন জ্বর হলো ?"—এই বলিয়া সে বিছানার ধারে বসিয়া পড়িল। হরিয়া লেপখানা ভিতরে রাখিয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

রমা কহিলেন, "ছোট বৌ কি কর্‌ছে রে ?"

—"বাবার একখানা শালের উপর পাড় তুল্‌ছে। ইস্ বাবা যা' কৃপণ, এ লেপখানা আগে উনি দিতেই চান্ নি ; আমি আন্‌লুম জোর করে। কই প্রমথদা' কোথায় ?"

রমাসুন্দরী অমিয়ার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "ছেলেমানুষ তুমি মা, তাই সব কথা বল্‌তে পারিনে। পুরনো আমলের একখানা অয়েল্ পেন্টিং ছিল, তার হাতে বেচ্‌তে পাঠিয়েছি সহরে। গেছে দুপুর বেলা, আস্‌বে এখুনি। তাই ত মা, তোমাকে কি খেতে দেই বল তো ?"

—"অমন কল্লে আমি কিন্তু এখুনি চলে যা'ব, জ্যেঠিমা ! আগে মনু ভাল হয়ে উঠুক্, প্রমথদা'র একটা কিছু ব্যবস্থা হো'ক্—খাওয়া ত' আছেই।"

রমাস্থন্দরীর চোখে জল আসিল; কিন্তু হাসি মুখে কহিলেন, "তোমাকে দেখ্‌লে ঠাকুরপোর সব ব্যবহারই ভুলে যেতে হয়। তোমার দেরী হ'লে তিনি বক্‌বেন না ত ?"

অমিয়া হাসিল। বলিল, "গা সওয়া হ'য়ে গেছে, জ্যেঠিমা; ওতে আর ভয় পাই নে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে অমিয়া বলিল, "আচ্ছা, জ্যেঠিমা ?"

—"কি মা ?"

—"এখানে আপনার এত কষ্ট, কল্‌কাতায় মামার বাড়ী যান্ না কেন ? তাঁরা ত সেবার নিতে এসেছিলেন।"

ভিতরে প্রদীপের আলো মৃদু। কিন্তু সেই অস্পষ্ট আলোকের আভায় যৌবন প্রান্তবর্ত্তিনী রমাস্থন্দরীর আয়ত মুখে একটি চাপা আত্মাভিমানের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। এই ঘরে দারিদ্র্য আছে, উপবাসী সন্তানের নিরুপায় দুঃখ আছে, কিন্তু এখানে আত্মকর্ত্তৃত্বের অমর্য্যাদা নাই। মুখুজ্জে বংশের সর্ব্বশেষ কুলবধূর অহঙ্কারের যে মহিমা তাহা রমাস্থন্দরীকে এই দুঃস্থ সংসারের মধ্যে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু রমাস্থন্দরী এই অপ্রিয় আলোচনা এক বালিকার নিকট অগ্রসর হইতে দিলেন না। নিঃশ্বাস ফেলিয়া অল্প কথায় শুধু কহিলেন, "স্বামীর ভিটে কি ছেড়ে যে'তে আছে মা ? স্বামীর কুঁড়ে ঘরেও মেয়েমানুষের সম্মান, সেই তার ইন্দ্রপুরী।"

কিছুক্ষণ পরে মন্নুর কপালে একবার হাত বুলাইয়া অমিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, এমন সময় প্রমথ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। অমিয়া কহিল, "বাবা কি ছেলে তুমি! সেই দুপুরে বেরিয়েছ, ফেরবার নামটি নেই। এতক্ষণ কোথায় ছিলে, শুনি?"

প্রমথ হাসিল। বলিল "মার কাজের সঙ্গে আমার একটা কাজ সার্‌তে গিয়েছিলাম।"

কৃত্রিম কোপের সহিত অমিয়া কহিল, "তোমার কি রাজকার্য্যটা শুনি?"

সহর হইতে কি যেন খাদ্যবস্তু প্রমথ সঙ্গে আনিয়াছিল, রমাসুন্দরী উঠিয়া সেগুলি তাহার হাত হইতে নামাইয়া লইলেন। বুঝা গেল যে কাজে সে বাহির হইয়াছিল তাহা শেষ করিয়া আসিয়াছে। এমন সময়ে সে ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "মন্নুর জ্বর কি বেড়েছে এবেলা?"

লেপের ভিতর হইতেই মন্মথ বোধ করি আহারের সন্ধান পাইয়াছিল। উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাড়েনি দাদা, লেপ গায়ে দিয়ে বরং কমে গেল।"

সবাই হাসিয়া উঠিল। অমিয়া বলিল, "বুঝতে পারলেন ত জ্যেঠিমা, নাস্‌পাতি-ও না খেয়েই ছাড়বে না।"

—"দেখ্‌ছি তাই", বলিয়া রমাসুন্দরী ফল কাটিতে বসিলেন।

কোন অজুহাতেই আর বিলম্ব করা চলে না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে এক সময় অমিয়াকে এই আনন্দের আসরটি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল, বলিল, "এবার আমি যাই জ্যেঠিমা—থাক্ থাক্, আলো ধরতে হবে না, হরিয়া আছে সঙ্গে"—এই বলিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু বাহিরে আসিয়া এদিক ওদিক খোঁজাখুজি করিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "ও জ্যেঠিমা, হরিয়া মুখপোড়া চলে গেছে, দেখুন ত কাণ্ডটা—"

রমাসুন্দরী সাড়া দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, প্রমথ যাচ্ছে, পুকুর পার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসুক্।"

কাছাকাছি আসিতেই অমিয়া কহিল, "লেপটা হরিয়াই আনতে পারত ; কিন্তু আমি এসেছিলাম তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে।"

—"কি আমার অপরাধ ?"

—"দু'দিন ধরে জন্তী গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকি—তোমার চুলের টিকি দেখবার যো নেই। কলেজে ভর্ত্তি হবার কি করলে ?"

প্রমথ কহিল, "যাদের পেটে অন্ন নেই, তারা কলেজে পড়বে কোথা থেকে।"

দুইজনে ধীরে ধীরে চলিতেছিল। অমিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "তুমি জান বাবা তোমাদের বাকী সম্পত্তিটুকুও নীলামে চড়াচ্ছেন ?"

—"সে কি ?"

—"হাঁ, তাই। তোমাদের থলি পাতলা না হলে বাবার থলি মোটা হবে না।"

প্রমথ বলিল, "বিষয় আশয়ের কথা আমি এখনও ভাল বুঝিনে ; কিন্তু যা' আছে তাও গেলে আমাদের যে আর কোন সংস্থানই থাক্‌বে না। আচ্ছা, অমিয়া, একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌লে রাগ কর্‌বে না বল ?"

—"আগে শুনি, তারপর বলবো।"

চলিতে চলিতে সলজ্জ কণ্ঠে প্রমথ কহিল, "শুন্‌লুম যে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে ?"

অমিয়া রাগ করিয়া কহিল, "তা'তে তোমার দরকার কি ? আগে তুমি নিজের কথা ভাব, তারপরে ভেব' পরের মেয়ের বিয়ের কথা।"

—"না, তাই বলছি, কেবল জান্‌তে ইচ্ছে হয়েছিল।"

বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছাইয়া দিয়া প্রমথ চলিয়া যাইতেছিল, সহসা অমিয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "এই বুঝি তোমার বিদ্যে ? মাঝ রাস্তায় এনে মেয়েছেলেকে ছেড়ে দেওয়া ? যদি সাপখোপে কামড়ায় ?" প্রমথ হাসিয়া অগ্রসর হইয়া কহিল, "বেশ যা' হোক্, ফেরবার সময় আমায় এগিয়ে কে দেবে শুনি ?"

"ওমা তুমি যে পুরুষ মানুষ"—বলিতে বলিতে অমিয়া

বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া সাড়া শব্দ করিয়া তাহার মাকে ডাকিল।

শৈলবালা বসিয়া মহাভারত পাঠ করিতেছিলেন, তিনি সাড়া দিলেন। অমিয়া আসিয়া জানাইল, প্রমথ আসিয়াছে। পাশের ঘরেও অপর এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সাড়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না। কেবল তাঁহার গড়গড়ার আওয়াজটা সকলের কাছে তাঁহার অস্তিত্বের কথা জানাইয়া দিতে লাগিল।

শৈলবালা সমস্ত খবরই রাখিতেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাবা, আমি বলি কলেজে পড়ার চেষ্টা করে কাজ নেই। দেখতে দেখতে এমনই যখন অবস্থা হ'ল তখন মায়ের দুঃখ কি করে ঘুচ্‌বে সেই চেষ্টাই কর, একটা কাজ কর্ম্ম করবার চেষ্টা দেখ! কি বলিস্?"

তাহাদের আজিকার এই অভিশপ্ত দারিদ্র, নিরন্ন জীবনের এই নিত্য লাঞ্ছনা—ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী কে?—তিনি যে তাহারই কাকাবাবু শান্তিদয়াল ইহা প্রমথ বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বংশানুক্রমিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুণে শৈলবালার কাছে সেই চিত্তগ্লানি বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। সে একবার অলক্ষে অমিয়ার দিকে চাহিল, পরে মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আপনারা যা আদেশ করবেন তাই হ'বে কাকীমা।"

শৈলবালা কহিলেন, "মনু এখন কেমন আছে প্রমথ ?"

—"জ্বর খুব বেশী নয়, তবে ২।৪ দিন ভোগাবে মনে হচ্ছে।"

গলা নামাইয়া শৈলবালা কহিলেন, "দিদিকে বলিস্ মুখপোড়া মানুষ বকাবকি করে তাই দু' তিন দিন যেতে পারিনি। কি লোকের হাতেই পড়েছিলাম—হাড় ভাজা ভাজা হল। একটু বস্ দেখি বাবা।" এই বলিয়া শৈলবালা উঠিয়া অন্য ঘরে গেলেন।

অমিয়া মায়ের সহিত উঠিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া চুপি চুপি কহিল, "তুমি যা বেমক্কা, কাউকে বলো না যেন। এই রুমালখানা তোমার জন্যে তৈরী করেছি ; যখন সহরে যা'বে, এখানা যেন পকেটে থাকে।' শোন, মা ডাক্‌ছে ?"

প্রমথ উঠিয়া বাহিরে আসিল। স্বামীকে লুকাইয়া শৈলবালা খামারের খিড়কীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রমথ কাছে আসিলে তাহার হাতে একখানা দশটাকার নোট গুজিয়া দিয়া কহিলেন, "মনুর ওষুধ পথ্যির জন্য দিলাম বাবা নিয়ে যাও।"

—"কিন্তু কাকীমা—"

—"আচ্ছা, সব পরে শুন্‌ব, এখন যাও—রাত হয়েছে।"

প্রমথর চখে জল আসিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া সে অন্ধকারে চলিয়া গেল।

দুই

বড় একটা ভূমিকম্প অথবা ইতিহাসের একটা ওলোট-পালট হইলে তাহার ধ্বংসস্তূপের তলায় মানুষের কীর্ত্তিকাহিনী যেমন চাপা পড়িয়া যায়, অধুনা মুখুজ্জে বংশের হইয়াছিলও তাই। মৃত্যুর তাড়নায় সমস্তই যেন অনেকটা ধুইয়া মুছিয়া গেছে, দাবী করিবার অধিকার বজায় রাখিবার জন্য যে পৌরুষের প্রয়োজন হয় তাহা এই পরিবারের আর কাহারও নাই,—কেহ যে কোথাও অংশীদার হইয়া বাঁচিয়া আছে তাহারও সন্ধান করা কঠিন। বাকী আছে দুই চারিজন স্ত্রীলোক, কিন্তু তাহারাও কোনদিন কিছু প্রত্যাশা করিবার কথাটাও ভুলিয়া গিয়াছে।

এই পটভূমিরই এক নিভৃত কোণে থাকিয়া প্রমথ বড় হইয়া দেখিল আশা করিবার অথবা আশ্বস্ত হইবার কোন সম্বলই তাহাদের নাই। শিশুকাল হইতেই সে শুনিয়াছে এই সোনারপুরের তালুকই তাহাদের সকলের বড়। ইহার আশেপাশে একদা যে সোনা ফলিত তাহাতেই মুখুজ্জে ছিল ধনী, ছিল প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বৃহৎ পরিবার, ঘোড়াশালায় ছিল ঘোড়া, হাতীশালায় হাতী; তাহাদের ময়ূরপঙ্খী নৌকা চলিত নদীতে। কিন্তু আজও আছে সেই প্রান্তর, সেই মন্দস্রোতা

নদী, সেই প্রাচীন প্রাসাদের ধূল্যবলুণ্ঠিত ছোট ছোট কঙ্কাল এবং কোথাও কোথাও বা মহাকালের ছোট ছোট কাহিনীর অবশেষ।

জমিদারীর হিসাব নিকাশ লইবার বয়স প্রমথর হয় নাই। কোথায় কি আছে তাহারও স্পষ্ট নির্দ্দেশ খাতাপত্রের জটিল জাল ভেদ করিয়া সন্ধান করিবার শক্তি তাহার নাই—অথচ বাল্যকাল হইতে ইহাই সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল, তাহার দরিদ্র জননী হাত পাতিয়া আছেন শান্তিদয়ালের দরজায়। শান্তিদয়ালের অনুগ্রহ, অভিরুচি, ইচ্ছা ও খেয়ালের উপরই তাহাদের দুই ভাই ও মায়ের জীবন-মরণ নির্ভর করে। শান্তিদয়ালই তাহাদের অন্নদাতা এবং এই শান্তিদয়াল, অর্থাৎ গ্রাম সুবাদে তাহার কাকা—ইহারই নিকট লাঞ্ছনা, পীড়ন সহ্য করিয়া চলাই যেন তাহাদের পরিবারের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট নিয়তি। এই অদ্ভুত অবস্থার ভিতর দিয়াই প্রমথর কুড়ি বৎসর বয়স হইল। এখন সে সাবালক।

কিন্তু আজ বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়াইয়া যখন একটা বৃহত্তর জীবন তাহার চক্ষে রঙিন স্বপ্ন আনিল, তখন দারিদ্র্য ও অভাব ছাড়া আর কিছুই তাহার চোখে পড়িল না। তাহার অসীম কল্পনা ও উচ্চাশা কেবল চারিদিক হইতে ঘা খাইয়া নিজেরই অন্তরে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার শিরার ভিতরে অতীতকালের অমিত বিত্তশালী বংশের শোণিতধারা

তরঙ্গে তরঙ্গে চেতাইয়া উঠিতে লাগিল। রমাসুন্দরী পুত্রের এই নূতন চেহারা দেখিয়া একদিকে দুশ্চিন্তায় ও অন্যদিকে একটা নিবীড় হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। আশা তাহাকে নাচাইয়া তুলিল।

মাকে প্রমথ কিছু বলিল না, কেবল একদিন সকালে সে শান্তিদয়ালের বৈঠকখানায় গিয়া দাঁড়াইল। শান্তিদয়াল নানারূপ কাগজপত্র নাড়াচাড়া করিতেছিলেন; দুইজন লোক চৌকীর উপর বসিয়া কি যেন বৈষয়িক আলাপে ব্যস্ত ছিল।

প্রমথ ডাকিল "কাকাবাবু"!

শান্তিদয়াল মুখ তুলিলেন। হাসিমুখে বলিলেন, "এই যে প্রমথ, এসো—তারপর তোমার কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার কি হলো?"

প্রমথ বলিল, "কলেজে পড়তে গেলে এখন আর আমাদের চলবে না, কাকাবাবু।"

কাগজপত্রগুলি যেমন তেমন করিয়া মুড়িয়া শান্তিদয়াল এক পাশে সরাইয়া রাখিলেন। বলিলেন, "কেন বল দেখি? কলেজে বুঝি ফ্রিশিপ পাওয়া গেল না?"

—"আজ্ঞে না, সে চেষ্টা আমি করিনি।"

—"কেন? পড়তে তোমার মন নেই?"

প্রমথ বলিল, "মন থাকলেও অবস্থা নেই।"

—"অবস্থা ? হা হা হা হা—ওহে যারা উচ্চশিক্ষার দিকে এগিয়ে যায় দারিদ্র্য তাদের কি বেঁধে রাখে হে ?" শান্তিদয়াল বলিলেন, "এই বয়সে তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন হে প্রমথ ?"'

প্রমথ বলিল, "মন্মথই পড়াশুনা করুক, কিন্তু আমাকে জমি-জায়গার কাজকর্ম্ম দেখে শুনে নিতে হ'বে। আমাদের অবস্থা এ রকম ভাবে থাক্‌লে আর চল্‌বে না।"

শান্তিদয়াল একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "জমি-জায়গার কাজ-কর্ম্ম মানে ?"

শান্তিদয়ালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রমথ আর কোন দিন এমন করিয়া কথা বলে নাই, কিন্তু আজ সে মনোস্থির করিয়াই আসিয়াছে—আড়ষ্ট হইলে তাহার চলিবে না। সে কহিল, "আমাদের পৈতৃক সম্পত্তির কথা বল্‌ছি কাকাবাবু।"

শান্তিদয়াল কহিলেন, "পৈতৃক সম্পত্তি! তার আর আছে কি ?"

—"যা' কিছু আছে।"

তাহার কণ্ঠে যে ঈষৎ দৃঢ়তাটুকু প্রকাশ পাইল তাহাতে উপস্থিত দুইটি লোক তাহার দিকে মুখ ফিরাইল এবং কহিল, "এটি হরিনারায়ণ বাবুর বড় ছেলে না, শান্তিবাবু ?"

শান্তিদয়াল ঘাড় নাড়িলেন, পরে বলিলেন, "তুমি বোধ হয় জান যে, তোমাদের সর্ব্বশেষ তালুকটাও সেদিন নীলামে বিক্রী হ'য়ে গেছে।"

কথাটা শুনিয়া প্রমথ বলিল, "সে কথা মা জানেন বটে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। আমি সেই সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে নে'ব!"

—"কেমন ক'রে?"

—"যে ভাবে বেনামী সম্পত্তি সাধারণতঃ উদ্ধার করা হয়।"

—"কি বল্‌ছ হে?" শান্তিদয়াল হাসিলেন?

প্রমথর মুখের উপর দিয়া আর একবার রক্তোচ্ছ্বাস খেলিয়া গেল। গলা পরিষ্কার করিয়া সে কহিল, "কবে খাজানা বাকী পড়্‌ল, কবেই বা নীলামে উঠ্‌লো—এ সমস্তই আমার জানা দরকার। আমাদের সম্পত্তির যা' কিছু বিলি-ব্যবস্থা, সব আপনার হাত দিয়েই এতকাল হ'য়ে এসেছে—কিন্তু তার ফল হয়েছে এই যে, আজ আমরা সবাই উপবাস কর্‌ছি। আমাদের কি আছে আর কি নেই, সেটা এবার আমি জানতে চাই।"

শান্তি বাবুর মুখের চেহারা বদ্‌লাইয়া গেল। বলিলেন, "কিন্তু তোমাদের আর যে কিছুই নেই।"

—"তা' হ'লে আমাদের চল্‌বে কেমন ক'রে?"

—"যা'দের কিছু নেই, তা'দের যেমন করে' চলে। আজ যখন বড় হ'য়ে তুমি হিসেব-নিকেশ চাইছ, তখন আমাকেও পরিষ্কার বল্‌তে হয় যে, মুখুজ্জে বংশের নবাবীই তোমাদের

দারিদ্র্যের কারণ। খে'তে যদি না পাও প্রমথ, তবে বাপ-ঠাকুরর্দ্দাকে গাল দাও, আমার কাছে কৈফিয়ৎ নিতে এসো না।"

প্রমথ বলিল, "আপনি তা' হ'লে এতদিন কি কর্‌লেন?"

শান্তিদয়াল বলিলেন, "আমি এতদিন চেষ্টা কর্‌লুম, কিন্তু বাঁচাতে পারলুম না। একটি একটি করে' নিয়তির টানে সব হাত থেকে খ'সে' গেল—কিছুতেই রাখ্‌তে পারলুম না।"

ভিতরের দরজার পাশে অমিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রমথ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া কহিল, "এটা ত আপনার কথা, কাকাবাবু; এর মধ্যে আমাদের ত কোন ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা নেই।"

শান্তিদয়াল কহিলেন, "আমার কথা কি তুমি বিশ্বাস করো না?"

ভিতরের চাপা উত্তেজনা সহসা প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রমথ বলিয়া ফেলিল, "আপনার ওপরে বিশ্বাস করে' আমরা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি।"

শান্তিবাবু একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সিংহসাবক বড় হইয়া উঠিয়াছে। চোখে মুখে মুখুজ্জে বংশের সেই পুরাতন মহিমা ও বিক্রম, আত্মাভিমানের সেই অগ্নি আভা, কণ্ঠে সেই দৃঢ়তা—ইহাকে চিনিতে তাঁহার বাকী রহিল না। তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! সামলাইয়া কহিলেন, "তোমার মায়েরও কি এই কথা প্রমথ?"

প্রমথ বলিল, "মা যতদিন নাবালকের মা ছিলেন তখন তিনি কি বলেছেন আমি জানিনে, কিন্তু এখন থেকে আমার মুখ দিয়েই তিনি সব কথা বল্‌বেন। গত আঠার বছরের সমস্ত কাগজপত্র আপনি আমাকে দেখাবেন, এই আমার অনুরোধ রইল।" এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল।

শান্তিদয়াল ডাকিলেন, "দাঁড়াও প্রমথ।"

—"বলুন।"

—"তোমার এই কথার মানে আমার সঙ্গে এখন থেকে বিবাদ। এই বিবাদের অর্থ মাম্‌লা। তা' জান?"

"নিজের জীবন রক্ষার জন্য এবং সত্য তথ্য জানিতে যাওয়া যদি মামলা হয়, তাই হবে, কাকাবাবু।"

—"অনেক নীচেকার মাটি খুঁড়ে' তুল্‌তে হবে। তার মজুরী পোষাবে?"

প্রমথ বলিল, "তা' কর্‌তে হবে বৈকি!"

—"যাদের ঘরে অন্ন নাই, তা'দের এত রোখ?"

—"সে বিচার হ'বে যথাস্থানেই, কাকাবাবু।" বলিয়া প্রমথ তখনকার মত চলিয়া গেল। ঘরের ভিতরে তিনটি লোক মুখুজ্জে বংশের শেষ প্রতিনিধির দাম্ভিক উক্তি শুনিয়া, তেজদীপ্ত চক্ষু দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে বাতাসটা হাল্‌কা হইলে শান্তিবাবু কহিলেন, "পাথরে মাথা ঠুকে' মর্‌বে সেই কথাই বলে' গেল।

বুঝ্‌লে শ্রীধর, জাত সাপের বাচ্ছা কিনা, তাই আমাকে ছোবল দিতে এলো। আমার অপরাধ—আমি দু'টি করে' খাচ্ছি!"

শ্রীধর বলিলেন, "ওদের সম্পত্তির আপনিই ত অছি ছিলেন, শান্তিবাবু।"

—"সেই জন্যই ত চোর দায়ে ধরা পড়েছি। কিন্তু আমিও বলে রাখলুম তোমাদের সকলের সামনে দাঁড়িয়ে—যে অর্ব্বাচীন আজ আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে' গেল, তাকে আমি অল্পে ছাড়ব না। কাঁটা দিয়ে কেমন করে' কাঁটা তুলতে হয়, আমি জানি।"

শ্রীধর কহিল, "ওদের ধনেগড়ার তালুকটা কিনেছে ধনঞ্জয় চক্কোত্তি। পীরপুরের মহাজনরা বলছিল, আপনারই টাকায় ধনঞ্জয় কিনেছে। কথাটা কি সত্যি?"

শান্তিবাবুর মুখখানা একটু বিবর্ণ হইয়া আসিল। তিনি সহসা কহিলেন, "এ নিশ্চয় প্রমথর মায়ের রটনা। ভায়া, সত্যি মিথ্যে পরের কথা, কিন্তু বড় বংশের মেয়ে বলে' পরিচয় থাকলে হবে কি, কলকাতার মেয়েরা বড় ধড়িবাজ। বৌ-ঠাক্‌রুণ কি কম? ধার দিলুম টাকা ধনঞ্জয়কে, মানুষের দুঃসময়ে সাহায্য করলুম সেই হল আমার অপরাধ। পৃথিবী এই জন্যই আজ পাপে ডুব্‌লো।"

শ্রীধর এবং তাহার সঙ্গী সেদিনকার মত উঠিয়া পড়িল। তাহারা বাহির হইবার পর অমিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

বলিল, "সেই দিনই আপনাকে আমি বলেছিলাম বাবা, ওদের কাগজপত্র আর আপনি রাখবেন না—"

শান্তিদয়াল চেঁচাইয়া বলিলেন, "আমার শ্রাদ্ধ, আমার পিণ্ডি—নইলে ঐটুকু ছেলে এসে আমার মুখের ওপর ছোট বড় কথা বলে' যায়!"

অমিয়া কহিল, "ফেলে দিন ওদের কাগজপত্র; আপনার দরকার নেই। এই বয়সে আপনাকে ত কেউ দেখবে না; ওদের নিয়ে আপনার এত জ্বালা কিসের?"

—"জ্বালা দিক্, জ্বালার শোধ আমি নিতে জানি। আমি ওকে অল্পে ছাড়ব তোরা মনে করেছিস্? আমার ওপর অন্যায় যে করে, তা'কে আমি ভুলিনে।"

অমিয়া তাহার পিতাকে চিনিত; মনে মনে সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। পিতাকে শান্ত করিবার জন্য সে কহিল, "ওদের অভাব, তাই ওরা এসে আপনাকে নানা কথা শুনিয়ে যায়; এ'তে আপনি কিছু মনে করবেন না বাবা। আচ্ছা, ওদের কি আর কিচ্ছু নেই?"

শান্তিদয়াল বলিলেন, "কেমন করে' থাক্‌বে? বাপ ঠাকুরদাদা সর্ব্বনাশ করে' গেছে। দু'পুরুষের নবাবীর প্রতিফল এখন পাচ্ছে ওরা। আমি ওদের নায়েবী করেছি, এই আমার অপরাধ!"

অমিয়া বলিল, “মাম্‌লা করবে, তাই বুঝি আপনাকে ভয় দেখিয়ে গেল ?”

—“ভয় ! আমাকে ? ওরে, মুখুজ্জে বংশের নায়েবী করে’ এসেছি, ভয় পাব এমন জন্মই আমার হয়নি। আমাকে আজ যারা রক্তের গরমে বাড়ী চড়াও হ’য়ে অপমান ক’রে যাবে, আমিও দেখব তাদের অন্ন জোটে কেমন করে’।”—এই বলিয়া শান্তিদয়াল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অমিয়া সেইখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যত বিপদ ও যত দুর্যোগ যেন আজ চারিদিক্ হইতে তাহারই মাথার উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে। আসন্ন ঝটিকার সঙ্কেতে তাহার বুকের ভিতর ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল।

তিন

শান্তিদয়ালকে চোখ রাঙ্গাইয়া আসিয়া প্রমথ মনে মনে ভাবিল যে বৃথা আস্ফালনে ত কোন কাজ হইবে না, এখন যখন নিজমনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে তখন তার একটা উপায় ত করিতেই হইবে। বিষয় উদ্ধার করা মানে মামলা-জালা জড়িত হওয়া, মামলা জেতা মানে অকাতরে অর্থ ব্যয় এবং যত রকম ছল চাতুরী।

প্রমথ মনে মনে বলিল—"পয়সাইবা কোথায় পাই, ছল চাতুরীও আমার দ্বারা হইবে না! তবে কি দুঃখিনী মার দুঃখের অবসান নাই! অনাহারেই কি আমাদের জীবন অবসান নিশ্চিত! লোকের কত আত্মীয়-স্বজন থাকে বিপদের সময় সাহায্য করে, আমাদের কি কেহই নাই?"

প্রমথকে বিষণ্ণ দেখিয়া তাহার মাতা রমাসুন্দরী মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে শরীরটা কি খারাপ হয়েছে।"

"না মা—আচ্ছা, মা! আমাদের কি এমন কেহ ধনী আত্মীয় নাই যে দুই দিন তার কাছে গিয়ে একটু শান্তি পাই।"

"বাবা! সুসময় সকলেই বন্ধু বটে হয়
অসময় হায় হায় কেহ কার নয়!"

মায়ের দান

"মা কেন সকল বিষয় হাল ছেড়ে দাও, নিরাশ হলে কি চলে, ভেবে দেখ না যদি কোন আত্মীয়র সন্ধান মনে হয়।"

"দেখ্ বাপধন, একজন আমার হিতৈষী বাল্যবন্ধু ছিল; বহুদিন তার কোন সন্ধান পাইনি, সে ছিল আমার পিতৃবন্ধুর কন্যা, দু মাসের শিশুর মার মৃত্যু হয়। মা আমার নিজ স্তন্য দিয়ে তাকে বাঁচায়, সে আমার অপেক্ষা বয়সে তিন বছরের ছোট। তার বাবা আমার মার হাতে মাতৃহীনাকে তুলিয়া দিল, সেই অবধি আমরা দুজন নিজ বোনের মতই এক সঙ্গে লালিতা বর্দ্ধিতা হয়েছি, দশ বৎসর বয়সে তাঁর বাপের মৃত্যু হয়। অগাধ সম্পত্তি, ও সেই অনাথা শিশুর যাবতীয় ভার বাবার স্কন্ধে এসে পড়িল।

"আমরা দুইজনে একই রকম পোষাক পরতাম, একই রকম খাবার খেতাম। কখন জানি নি আমরা একই মায়ের পেটের দুই বোন নই।

"সৎপাত্রে বাবা আমাদের দুই জনের বিবাহ একই বছরে প্রদান করেন। তখন হতে বিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। পরস্পর অদর্শনে আমরা এমনই কাতর হতাম যে একমাস না দেখলে প্রাণ অতিষ্ঠ হত। বিবাহের কয়েক বৎসর সুখে কাটবার পরই দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হল।

"বোন্‌টি বিবাহের দুই বৎসর যেতে না যেতেই পতিহীনা হল। অপুত্রক ও বিধবা রমণীর যাহাতে আর্থিক কষ্ট না

পায় বাবা তাঁর পিতৃ-সম্পত্তির পাকা ব্যবস্থা করতে যাওয়াতে বোনের শ্বশুরমহাশয়ের সহিত বাবার মনোমালিন্য হল, বোন স্বামীর ভিটায় বাস করাই শ্রেয় মনে করল। সেই হতে বোনটির সহিত আমার কোন সম্পর্ক রইল না!"

মাসির গল্পটি শুনিয়া প্রমথর মনে এক আশার সঞ্চার হইল। তার দুই একদিন বাদে তাহার দাই-মা পুরাণ ঝি নৃত্যর সহিত পরামর্শ করিয়া সেই মাসিমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। রাস্তা হাঁটায় অনভ্যস্ত, অতি কষ্টে প্রমথ নৃত্যকে সঙ্গে লইয়া মালদহের উপকণ্ঠে দেবীগ্রামে পঁহুছিল।

সেদিন দেবীগ্রাম সহরতলী উৎসব মুখরিত। ডিভিসনাল কমিসনারের পত্নী "স্মৃতি অনাথালয়"এর বার্ষিক উৎসবে সভানেত্রী-রূপে আগমন করিয়াছেন, একখানি থামওলা বৃহৎ বাটী পত্র পুষ্পে সজ্জিত হইয়াছে। নহবৎ ধ্বনি উৎসবের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও মালদহ হইতে বহু নর-নারী উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছে। প্রমথ ও নৃত্য তাহাদের ক্লান্ত দেহ লইয়া সেই উৎসবে মাতোয়ারা নরনারীর ঢেউয়েতে মিশিয়া গেল। তখন অপরাহ্ন, সূর্যদেব অস্তাচলে গমনোন্মুখ।

প্রমথ হঠাৎ একটী ভিড়ের ধাক্কা খাইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল একজন দীর্ঘকায়া ক্ষীণাঙ্গী ইংরাজ মহিলা আসিতেছেন, গলে পুষ্পদাম, হস্তে পুষ্পগুচ্ছ। সহাস্য-বদনে তিনি পার্শ্বস্থিত

এক উজ্জ্বলবর্ণা, স্থূলকায়া শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা, তেজদীপ্ত সকরুণ-নয়না মহীয়সী বঙ্গ বিধবার সহিত কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইতেছেন। মেম সাহেব দুই পার্শ্বে সমবেত নর নারীদের অভিবাদন করিতে করিতে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। হঠাৎ সেই বিধবা রমণীর চক্ষু তেজদীপ্ত সুন্দর সুকোমল এক যুবকের দিকে পড়িল, তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মেম সাহেবকে বিদায় দিয়া অনাথ আলয়ের কার্য্যালয় গৃহে সেই বিধবা রমণী ফিরিয়া আসিলেন। অট্টালিকার সদরের সিঁড়ির ধাপের উপর তখন প্রমথ সমস্ত দিনের অনাহারে ও পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়াছিল। সেই বিধবার সহিত উর্দ্দিপরা দ্বারবান অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া রাস্তা করিয়া দিতেছিল। প্রমথকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিতে প্রমথ পড়িয়া গেল। আর্ত্তনাদের শব্দ শুনিয়া উৎসবকর্ত্রী বালকের নিকট গমন করিয়া যখন জানিলেন যে তাঁহার সারাদিন আহার হয় নাই, বিদেশ হইতে আসিয়াছে, তাহার আহার ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রমথ ও নৃত্য পরিচয় সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারিলেন এই মহিলা স্মৃতিদেবী অনাথালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী এবং জমিদার রমণী।

স্মৃতিদেবী তাহাকে দেখিবার পর হইতেই যুবকের প্রতি তাহার মমতা পড়িল। তাহার মুখখানি দেখিয়া, তার বাল্য-

সহচরী ও আশ্রয়দাত্রীর কন্যার মুখ চিত্তে ভাসিয়া উঠিল। এই অঞ্চলে স্মৃতিদেবীকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। সকলেই তাঁহার মাতৃস্নেহ পাইয়া থাকে।

প্রমথ ও নৃত্য মনে মনে বুঝিতে পারিল এই মহিলাই প্রমথর মার ভগ্নী।

পরদিন যখন পূজা শেষ করিয়া স্মৃতিদেবী অনাথ আলয়ে পূজার প্রসাদ বিতরণ করিতে গমন করিতেছেন—তাঁহার সেই দীপ্ত, পূত চেহারা দেখিয়া প্রমথর মস্তক আপনা হইতে তাঁর চরণে লুটাইয়া পড়িল। স্মৃতিদেবী প্রমথর সকরুণ চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ ও বিচলিত হইল।

কাছে বসাইয়া প্রমথর পরিচয় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিল। যখন জানিলেন প্রমথ তাঁহারই বোন্‌পো, তখন তাহার দুই আঁখি দিয়া বারি নীরবে ঝরিতে লাগিল। সস্নেহে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বারংবার তাহার মস্তক চুম্বন করিতে লাগিলেন। অপুত্রক মহিলার অপত্যস্নেহ যেন প্রবাহিত হইতে লাগিল। মনে করিতে লাগিলেন চিরকাল যেন অঞ্চল দিয়া ঢাকিয়া বক্ষে করিয়া এই সোনার পুতুলীকে রাখি। তাঁহাকে লইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না।

তারপর কয়েকদিন ভাল খাওয়া-পরা পাইয়া প্রমথর মন একটু প্রফুল্ল হইলেও, দুঃখিনী মা ও আতুর ভাইটির মুখ মনে পড়ায় বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

স্মৃতিদেবীর চোখে তাহা এড়াইয়া গেল না, জিজ্ঞাসিলেন —"প্রমথ! তোমার মুখ এমন মলিন কেন?"

"কই, ছোট মা? কিছু না!"

"কেন বাবা আমার কাছে মনের ব্যথা চাপ্‌ছ—আমি গর্ভধারিণী না হলেও, তোমার মনের ব্যথা আমার প্রাণকে আকুলিত করে।"

তখন প্রথম কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মার নিঃসহায় অবস্থা, শান্তিদয়াল কিরূপে তাহাদের জমিজমা সব ফাঁকি দিয়া লইয়াছে, স্বল্পাহারে, বিনা চিকিৎসায় তাহার অনুজ কত ক্লেশ ভোগ করিতেছে সবই অকপট-চিত্তে স্মৃতিদেবীর নিকট বর্ণনা করিলেন। ঘটনা সব শুনিয়া স্মৃতিদেবীর চিত্ত রোষে ভরিয়া উঠিল এবং তাঁহাদের দুঃখে বিগলিত হইয়া গেল। পর দিনই এক খানি গরুগাড়ী বোঝাই করিয়া সংসারের যাবতীয় খাবার দ্রব্য প্রমথর মার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নৃত্য ঝি সেই সঙ্গে গ্রামে ফিরিয়া গেল।

স্মৃতিদেবী বলিলেন—"দেখ নৃত্য, দিদির চরণে আমার প্রণাম জানাইও, বলিও প্রমথ যেমন তার ছেলে তেমনিই আমার, আমি কিছুদিন তাহাকে ছাড়ব না—আর বলো আমার যা কিছু সবই প্রমথ ও মন্মথর, তিনি যেন কোন বিষয় কুণ্ঠা বোধ না করেন।"

নৃত্য স্মৃতিদেবীকে প্রণাম করিয়া বলিল—"প্রমথর বহু

জনমের সুফল যে আপনার শ্রীচরণে ঠাঁই পায়। ছোট মা তোমায় ছেড়ে আমার এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছা করছে না! কি আদর, কি স্নেহ তোমার, ছোট মা!"

"আমি আবার তোমার কি করলাম?"

—"মা তুমি যা বাছাদের করলে, তা অন্তর্যামী ভগবানই সব জানেন। এখন প্রমথ যেন তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় পেয়ে বড় হয়।"

"যা করেন সবই ভগবান! মানুষ নিমিত্ত মাত্র! আবার অসিস্ নৃত্য।" নৃত্য জিনিষপত্র লইয়া চলিয়া গেল।

স্মৃতিদেবী কেবল খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়া নিরস্ত রহিলেন না; তাঁহার উকিলকে ডাকাইয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, "উকিল বাবু, দেখুন এই নাবালকের পীড়নকারী শান্তিদয়ালকে যে কোন উপায়ে শাস্তি দিতে হবে। যা খরচ হবে সব টাকাই আমি দেব।"

উকিলবাবু বলিলেন—"আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব, আপনার নায়েবমহাশয়কে তদবীরের জন্য একটু খাটতে হবে।"

স্মৃতিদেবী বলিলেন—"আমি তার ব্যবস্থা করব।"

উকিল মহাশয় চলিয়া যাইবার পর স্মৃতিদেবী তাহার নায়েব গোমস্তা সকল আমলাদের ডাকিয়া বলিলেন—"দেখুন —সোনাপুরের মুখোজ্জেদের বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধার করতেই

হবে, এ বিষয় আমি আপনাদের আন্তরিক সাহায্য চাই। আর এই যুবকের দিকে চেয়ে দেখুন! ইহার গ্রাসাচ্ছাদন ও মান-সম্ভ্রম রাখতে হবে; মনে করবেন এই আমার এক মাত্র পুত্র আপনাদের ভবিষ্যৎ মনিব।"

প্রমথ স্মৃতিদেবীর এই কথাবার্ত্তা শুনিয়া স্তম্ভিত, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে তাহার হৃদয় প্লুত, সে চক্ষুর জল সম্বরণ করিয়া স্মৃতিদেবীর চরণ স্পর্শ করিল, বলিল—"তুমি আমার ছোটমা।"

স্মৃতিদেবী হাসিয়া বলিল, "মাসিমা নই!"

কয়েক দিনের মধ্যে শান্তিদয়ালবাবুর নিকট হিসাব নিকাশ লইবার এবং বেনামী নিলাম খরিদ জমিদারী উদ্ধারের জন্য জোর ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। প্রমথ তার মার নিকট যাইবার জন্য বড়ই উতলা হইয়া উঠিল। কাগজপত্র ও বিষয়-আশায় সন্ধান করিবার জন্যও তার সোনারপুরে যাওয়া একান্তই প্রয়োজন।

স্মৃতিদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার বিচক্ষণ নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে প্রমথ সোনারপুরে যাত্রা করিল। যাইবার সময় স্মৃতিদেবী বলিলেন,

"মা বলে যখন ডেকেছিস্, তখন আর ভুললে চলবে না, শীঘ্রই এসো!"

চার

দেবীগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিবার পর রমাসুন্দরী প্রমথকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সবে মাত্র প্রমথর কুড়ি বছর পার হইয়াছে; সেদিনও সে যেমন বালক ছিল আজিও তেমনিই আছে। কিন্তু কেমন করিয়াই যেন সে রাতারাতি মানুষ হইয়া উঠিল। অপরিণত মনের উপর দুঃখ-দারিদ্র্য আর সংঘাত আসিয়া পড়িলে তাহা যেমন দৃঢ়, বিচক্ষণ ও হিসাবি হইয়া উঠে, পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রমাসুন্দরীরও সেই কথা মনে হইল। গর্ব্বে ও সুখে তাহার বুক ফুলিয়া উঠিল; আনন্দের অসহনীয় বেদনায় তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রুর ধারা নামিল।

আঁচলে চোখ মুছিয়া তিনি কহিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, ঠাকুর-পোর সঙ্গে বিবাদ করে' এলি?"

প্রমথ কহিল, "একে তুমি বিবাদ বল মা? নিজেদের সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ চাইতে গেলে যদি রাজার সঙ্গেও বিবাদ বাধে, তা হ'লেও পিছুপা হ'ব না। হয়ত আমরা কিছুই ফিরিয়ে পা'ব না, হয়ত কিছুই আমাদের নেই, কিন্তু কাকার কাছে স্পষ্ট জান্‌তে চাই আমরা সর্ব্বস্বান্ত হ'লাম কোন্‌ পথ দিয়ে।"

রমাসুন্দরী বলিলেন, "ফল কি কিছু হ'বে ?"

ঘাড় নাড়িয়া প্রমথ বলিল, "কিছু হ'বে বৈকি। কাকা আমাদের যেটুকু ভিক্ষে দিতেন, তাও বন্ধ করে দেবেন।"

রমাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন। এই ভিক্ষার অর্থ আর কেহ না জানিলেও, তিনি জানিতেন। এই গ্রামের ভিতরে থাকিয়া, এই সঙ্কীর্ণ, শতজীর্ণ ও ভগ্ন দুইখানি ঘরে বসিয়া অন্নের অভাবে দুই পুত্রসহ তাঁহাকে শুকাইয়া মরিতে হইবে। সহায় নাই, সম্পদ নাই, বিপদে আপদে দেখিবার মানুষের অভাব—এমন অবস্থায় গ্রামের ভিতরে সর্ব্বশক্তিমান শান্তি-দয়ালের সহিত বিবাদ বাধানর অর্থ জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত কলহ করা। শান্তিদয়ালের বিরাগভাজন হইয়া এ অঞ্চলে কেহই রক্ষা পায় নাই। আর, তাহা ছাড়া, তাঁহার সহিত মাম্‌লা বাধিলে, তাঁহার স্ত্রী শৈলবালার সহিতই বা সদ্ভাব থাকিবে কেন ? তাহার নিকট হইতেও সকল রকমের সাহায্য বন্ধ হইবে। শঙ্কিতচক্ষে এবং কম্পিতকণ্ঠে রমাসুন্দরী অগ্রসর হইয়া প্রমথর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন।

"ছিঃ বাবা, যা' গে'ছে তা' যা'ক্, তো'রা বেঁচে থাক্‌লে আমার কিছুতেই দরকার নেই ; কিন্তু ওর সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ো না, এ গ্রামে টিকে থাকা কঠিন হ'বে।"

প্রমথ কহিল, "তুমি মুখুজ্জে বংশের বউ হয়ে এই সামান্যতে ভয় পাও মা ?"

ভয় !—রমাসুন্দরী একবার ঢোক গিলিলেন। স্বামী ও শ্বশুরের অপরাজেয় বিক্রম ও প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া একবার তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, পৈতৃক পরিচয়ের কথা মনে করিয়া অসহ্য গর্ব্বে তাঁহার হৃদয় একবার চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য—যেন একটা হাউই জ্বলিয়া উঠিয়া পরমুহূর্ত্তেই ছাই হইয়া গেল। তিনি মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, “ভয় নয়, বাবা, দুর্ভাবনা। তোর মা কি কোন-কালে ভয় পেয়েছিল রে? তোর আর মনুর কথা ভেবে আমি আর কিছুতেই সাহস পাইনে, বাবা।”

প্রমথ তাহার মায়ের পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। কহিল, “আমি আর মনু—আমরাও মুখুজ্জে বংশের ছেলে, আমরাও অন্যায় সইতে পা'রব না, মা। জীবনে মাথা হেঁট করে থাক্‌লে লোকের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মাথা উঁচু না করলে বড় হওয়া যায় না।”—এই বলিয়া প্রমথ চলিয়া গেল। রমাসুন্দরী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সেই সিংহ-শাবকের পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দিন পাঁচছয় পরে একদিন শান্তিদয়াল আসিয়া এই বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, “বৌ-ঠাক্‌রুণ, ঘরে আছেন না কি?”

রমাসুন্দরী একখানা ধুতি সেলাই করিতেছিলেন, সেটা ফেলিয়া বাহিরে উঠিয়া আসিলেন। মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া

বলিলেন, "আপনাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলুম এই সব কথাই বলবার জন্য।"

শান্তিবাবু কহিলেন, "বৌঠান্, চিরকাল আপনাদের খেয়েই আমরা মানুষ, সে কথা আমি ভুলিনি। আপনি যা' হুকুম কর্‌বেন তা' মাথা পেতে নেওয়াই আমার কাজ, কিন্তু আজ প্রমথ সে পথ আর খোলা রাখ্‌ল না।"

রমাসুন্দরী বলিলেন, "প্রমথ ছেলে মানুষ, একটা ঝোঁক্ তার হ'য়েছে, তার ব্যবস্থা আপনিই করুন, আমি বলি। অকারণে একটা বিবাদ বাধ্‌বে, এ আমি পছন্দ করব না। তা'কে আপনি নিরস্ত করুন।"

শান্তিবাবু বলিলেন, "কি করব, আদেশ করুন।"

রমাসুন্দরী কহিলেন, "অমিয়ার মাকে আমি বলেছি, আপনার কাছে সাবেক হিসেব-পত্র যা' আছে সে সব আপনি প্রমথর হাতে তুলে' দিন।"

শান্তিবাবু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া উঠিলেন, "হিসেবপত্র! আপনি বলেন কি? এমন কিছুই নেই যার মধ্যে কোন হিসেব হদিস পাওয়া যা'বে। শেষকালে যেটুকু ছিল, তাও সেদিন নীলামে উঠ্‌ল। মুনাফা এক কাণাকড়িও নেই, অথচ সরকারী খাজনা দেওয়া চাই। বৌঠান্ বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু যা'র মরণদশা লেগেছে তার আর কোনও আশা নেই।"

রমাসুন্দরী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "চিরদিন তা'র মরণদশা ছিল না, ঠাকুরপো।"

• —"জানি সব, তবু এমন ক'রেই ত সব গেল। যাঁরা স্বর্গলাভ করেছেন, আজ তাঁদের বিরুদ্ধে কোন নালিশ নেই, কিন্তু মরণদশা ঘটেছিল তাঁ'দেরই হাতে। তাঁরা আমার কাছে দায়িত্ব দিয়ে যা'ননি, দিয়ে গেছেন সর্ব্বনাশের অবশেষ।"

—"এ সব কথা প্রমথ কি শুনেছে?"

—"না, তা'র শরীরে নতুন রক্ত—শুন্‌বার ধৈর্য্য তা'র নেই; শুনলে স্বীকারও করবে না, বিশ্বাসও হবে না। নতুন আদর্শ নিয়ে সে বড় হ'য়েছে, তার ধারণা—তা'র অভাবের জন্য তা'রাই দায়ী যা'রা কায়ক্লেশে পেটের ভাত করে খা'চ্ছে। মনের মধ্যে এই দাহটাই তা'র রি রি কর্‌ছে যে আমি আপনাদের প্রতারিত করে এসেছি। ভিতরে লোক আছে!"

রমাসুন্দরী নত মস্তকে আর একটু ঘোমটা টানিয়া দিলেন। বলিলেন, "আজ চারদিন হ'ল সে মালদহে গেছে আমার এক বোনের বাড়ী; কি যে করছে সেই জানে।"

শান্তিবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আর একজন জানে, সে আমি। চার দিন কেন, পূর্ব্ব হতেই নানা মতলব ও যাতায়াত চলেছে, গাড়ী বোঝাই করে রসদ আসছে। আমার অন্নে পালিত কুকুররা যোগ দিয়েছে, সবই খবর রাখি বৌঠান!

আপনাদের সম্পত্তির আমি ছিলুম অছি, আমি এতকাল আপনাদের ঠকিয়ে এসেছি; তার কাগজপত্র আর হিসেব নিকেশ দাবী করে' দিন তিনেক আগে সে নালিশ ক'রেছে।"

রমাসুন্দরী কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "নালিশ ক'রেছে সে!"

—"হাঁ, নালিশ ক'রেছে আমার বিরুদ্ধে।"

—"আপনি রদ কর্‌তে পারলেন না?"

—"পারতুম, কিন্তু করিনি। এতে প্রমথর ভালই হ'বে, কারণ সে বুঝতে পারবে এই কথাটা যে, মরা গরু ঘাস খায় না। বৌঠান, হাতে-কলমে শিক্ষা করাই উঁচু দরের শিক্ষা।"

—"আপনি এখন কি কর্‌বেন?"

শান্তিবাবু পুনরায় উচ্চ হাসি হাসিয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ ভরিয়া দিলেন। বলিলেন "সকল শাস্ত্রে যা' বলে এখন আমাকে তাই করতে হ'বে—অর্থাৎ আত্মরক্ষা। মিছে কথা—হ্যাঁ, মিছে কথা জীবনে বলিনি, কিন্তু মাম্‌লা মানেই ত মিছে কথা, সুতরাং মাম্‌লায় জিততে গেলে কালোকে শাদা, আর শাদাকে কালো করে' তুলতেই হবে। তবু আজ আপনাকে জানিয়ে যাই বৌঠান, প্রমথ আর মনু আমার পর নয়। অমিয়া আর তা'র মাও আপনার পর নয়। পুরুষে পুরুষে যত বিবাদই হউক সেটা বাইরের, বাড়ীর মধ্যে যেন সেই আগুনের ফিন্‌কি ছিটকে না আসে।—হ্যাঁ, আর এক কথা। সদ্ভাবের অবস্থায় যাতায়াতে

কুটুম্বিতা বাড়ে, কিন্তু অসদ্ভাবের মধ্যে আনাগোনায় আগুনটা ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকে, নিবতে চায় না। আমি বলি বৌঠান মামলা না মেটা পর্য্যন্ত আমাদের পারিবারিক সম্পর্কটা আপাততঃ স্থগিত থাকুক, ভবিষ্যতে আবার সহজ হবার সম্ভাবনা থাকবে। আচ্ছা, আজ প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিই, বৌঠান।"

স্তব্ধবিমূঢ় রমাসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া শান্তিবাবু বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় একখানা গরুর গাড়ী মচ্ মচ্ শব্দ করিতে করিতে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়োয়ান প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁ কর্ত্তা, এই ত মুখুজ্জে বাড়ী?"

শান্তিবাবু মুখ ফিরাইয়া লক্ষ্য করিলেন গাড়ীর ছইয়ের ভিতরে রাশিকৃত মালপত্র। প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী, কাপড়ের গাঁট, বিছানার সরঞ্জাম, পিতলের নানাবিধ বাসন, দুইচারিটা গৃহসজ্জা—অর্থাৎ গাড়ীর ভিতরে একটা বৃহৎ সংসার আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শান্তিবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কোথা থেকে এসব এসেছে রে?"

গাড়োয়ান কহিল, "আজ্ঞে, মালদহ দেবীগ্রাম থেকে।"

—"কে পাঠালে?"

—"এই মুখুজ্জে বাড়ীর প্রমথবাবু।"

এমন সময় মনু আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কাকাবাবু, দাদা এসব পাঠিয়েছে আমাদের জন্যে। এই গাড়োয়ান্, গাড়ী ভেতরে আনো।"

শান্তিবাবু একবার এদিক ওদিকে তাকাইলেন। দূরে রমাস্থন্দরীকে তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে শুনাইয়া কহিলেন, "বেশ বেশ, যাও, ভেতরে নিয়ে যাও। ছেলে বড় হলে গেরস্থর আর ভাবনা কি। দেখেশুনে ভারি খুসি হলুম।"

গাড়োয়ান সমস্ত মালপত্র সমেত প্রাঙ্গণের ভিতরে গাড়ী লইয়া গেল। আশপাশে, গ্রামের কয়েকজন স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা ইহাদের এই সৌভাগ্য দেখিয়া মুখুজ্জে বংশের প্রাচীন গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিল এবং তাহাই লক্ষ্য করিতে করিতে এক সময় শান্তিদয়াল দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত মুখ ভারি করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহা তিনি লক্ষ্য করিলেন না যে, প্রবাসী সন্তানের কথা স্মরণ করিয়া পিছনে একটি নারীর ঘোম্‌টার নিচে অশ্রুর ধারা নামিয়া আসিয়াছে।

সংবাদ রটিতে বিলম্ব হইল না। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সকলেই জানিতে পারিল হরিনারায়ণ মুখুজ্জের ছেলে এখন আর নাবালক নাই, সে বড় হইয়া নায়েব শান্তিদয়াল চাটুজ্যের নামে নালিশ করিয়াছে, গ্রামে ঝড় উঠিয়াছে। হাটে, মাঠে, ঘাটে এই লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। সে দিনকার নাবালক কখন মানুষ হইয়া উঠিল, কোথা হইতে টাকা পয়সা পাইল, কে সাহায্য করিল, কে তাহাকে সাহস

দিল—কেহ তাহার কোন সংবাদই পাইল না। সমস্তটাই—রহস্যময় হইয়া উঠিল।

মালদহ সহর হইতে সোনাপুরা বার তের মাইল পথ। কাছারীর কাজকর্ম্ম সারিয়া সেই দীর্ঘপথ হাঁটিয়া সোনাপুরার নিকট আসিয়া পৌঁছিতে প্রমথর সন্ধ্যা হইয়া গেল। পাঁচ ছয় দিন সে শহরে তাহার মাসীমা স্মৃতিদেবীর ওখানে ছিল। মা ও মনুর কোন খবর না পাইয়া এই কয়দিন তাহার অতিশয় উদ্বেগে কাটিয়াছে। গতকল্য সকালে গরুর গাড়ী ছাড়িবার সময় সে মনে করিয়াছিল ঐ গাড়ীতেই সে চলিয়া আসে, কিন্তু কাছারীর কাজ ও নিঃসন্তান মাসীমার উদ্বেলিত বাৎসল্যের মধুর আকর্ষণ ছাড়িয়া সে কাল বাহির হইতে পারে নাই। প্রমথ দ্রুত পদে গ্রামের আঁকা বাঁকা পথ পার হইয়া বাড়ীর দিকে চলিতেছিল। স্মৃতিদেবীর স্নেহের কথা মায়ের কাছে বিবৃত করিবার জন্য সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

শুক্লা নবমীর সন্ধ্যা। শীতের অবশেষ তখনও কিছু ছিল, কিন্তু অল্প অল্প নূতন হাওয়া উঠিয়াছে। দিনের আলো ম্লান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শুক্ল জ্যোৎস্নায় সমস্ত ফসল কাটা রুক্ষ মাঠ ইহারই মধ্যে ভরিয়া গেছে। প্রমথর পা দুইখানা ক্লান্ত, মন অধিকতর শ্রান্ত—কিন্তু গত কয়েকদিনের অতিশয় ঝড়ঝঞ্ঝার পর আজ যেন তাহার সমস্ত মন সকল উদ্বেগ অতিক্রম করিয়া এই চন্দ্রময়ী সন্ধ্যার এক অজানা

বেদনায় টন্ টন্ করিতেছিল। তাহার স্বপ্ন দেখিবার বয়স। দূর মাঠের সীমায় সীমায় তাহার স্বপ্নালু সুন্দর দুই আয়ত চক্ষু আপন প্রাণের রূপই মুগ্ধ মনে দেখিতে দেখিতে চলিতেছিল।

সহসা পিছন হইতে সাড়া পাইয়া সে সচকিত হইল। ফিরিয়া চাহিয়া সে লক্ষ্য করিয়া কহিল,"কি-রে হরিয়া নাকি ?"

"হ্যাঁ বাবু, এই আমরা যাচ্ছি।"

"কে ?—ও, তো'র দিদিমণি বুঝি সঙ্গে ?"

"হাঁ, বড়দাদাবাবু, হাম্ লোক্ গিয়েছিলাম পিসীমার মোকান্মে—আপনি এ ক'দিন ছিলেন না। ওই যাঃ—ভুলে গেছি দোকান্সে তামাকু আন্তে।"—এই বলিতে বলিতে মুখ লুকাইয়া হরিয়া তামাকুর সন্ধানে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

অমিয়া থতমতভাবে দাঁড়াইয়া কহিল, "ওর সব মিছে কথা। আজ সকালেই বাবার জন্যে তামাক এনেছে, সাত দিনেও ফুরোবেনা।"

প্রমথ বলিল, "তবে কেন গেল তামাক আনতে।"

—"তামাক আনতে যায়নি ; ওই ব'লে' সড়ে' পড়ল।"

প্রমথর পুনরায় কৌতূহল হইল, কিন্তু নিজের প্রশ্ন দমন করিয়া কহিল, "কাকীমার অসুখ করেছে নাকি, শুন্লাম ?"

অমিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আমাদের কোন বিপদ ঘটলে তোমাদের ত কোন ক্ষতি নেই।"

আঘাত পাইয়া প্রমথ চুপ করিয়া গেল। নারীর অন্তর রহস্য উপলব্ধি করিবার বয়স তাহার এখনও হয় নাই। সে কেবল ছেলেমানুষের মত কহিল, "তোমার মা আমারও ত কাকীমা, অমিয়া ?"

"থামো, প্রমথদা আর দরদ দেখাতে হবে না", উষ্ণকণ্ঠে অমিয়া কহিল, "এক হাতে ঘরে আগুন দিয়ে অন্য হাতে সেই আগুনে আলু-সিদ্ধ খেতে চেয়ো না। জ্ঞাতি নয়, কুটুম্ব নয়, রক্তের সম্বন্ধ নেই—কে বলে'ছে মা তোমার কাকীমা ? বাজে কথা বলো কেন ?"

মৃদুপদে চলিতে চলিতে প্রমথ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, "ওঃ, তাহ'লে তুমিও আমাদের কেউ নয় বলো ?"

অমিয়া একরূপ নির্দ্দয় হাসি হাসিল এবং তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রমথ মাথা নীচু করিল। অমিয়া কহিল, "বাবার নামে নালিশ করেছ, এর পরেও কি আমাদের আত্মীয় বলে মানো ?"

প্রমথ কহিল, "আমিত কোন অন্যায় করিনি, অমিয়া।"

"অন্যায় করোনি, কেবল জব্দ কর্‌বার চেষ্টা করেছ !"

"জব্দ !—না না, নিজের অধিকার চাওয়া কি জব্দ করা ? তুমি ত জান যে আমরা সর্ব্বস্বান্ত। আমরা চিরদিন দরিদ্র থাকি, এই তুমি চাও।" প্রমথর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

অমিয়া কহিল, "বাবাকে জেলে পাঠিয়ে কি তোমরা বড় লোক হ'বে ?"

"না, বড়লোক হ'তে চাই না, কেবল পেটের অন্ন চাই। তোমার কাছে লুকাবো না। সমস্ত দলিলপত্র তোমার বাবা বেনামী ক'রেছেন, আমাদের সম্পত্তির মুনাফা তোমার মায়ের নামে সুদে খাট্‌চে। গত পরশু দিন কাকাবাবু পাঁচশ' টাকা গোপনে ঘুষ দিয়ে কাছারী থেকে কাগজপত্র সরাবার চেষ্টা করেছিলেন—তুমি জান শীঘ্রই তাঁকে রাজদরবারে অভিযুক্ত হ'তে হ'বে? আরও অনেক কথা বল্‌তে পারি অমিয়া, শুন্‌লে তুমি বড় ব্যথা পা'বে—তাই বল্‌ব না।"

অমিয়া বড় বড় চোখে চাহিয়া কহিল, "বাবা এই করেছেন? এর প্রমাণ কি?"

প্রমথ কহিল, "পনেরো দিনের মধ্যে যখন আরও অনেক কিছুর প্রমাণ পাবে, তখন কি কর্‌বে?"

নম্র রুদ্ধকণ্ঠে অমিয়া কহিল, "আমার বাবাকে তুমি বিপদে ফেলো না, প্রমথ দা'।"

"তিনি যে আমাদের সবাইকে পথে বসিয়েছেন? দেখ্‌তে পাচ্ছনা কাঙালের মত আমরা এক মুঠো অন্নের জন্য সকলের দ্বারস্থ হচ্ছি?"

"কিন্তু, এর পরিণাম কি জানো?"

"পরিণাম!"—প্রমথ ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "হয়ত তোমরা আর আমরা—দুই পরিবারই ধ্বংস হ'য়ে যাব।"

কম্পিত কণ্ঠে অমিয়া কহিল, "তার পরে আর কিছু ভেবে' দেখেছ তুমি, আর কারো কিছু হবে ?"

প্রান্তর ভরা জ্যোৎস্নার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কম্পিত হৃদয়ে প্রমথ কহিল, "কৈ, এর চেয়ে বেশী আর কি হ'তে পারে ?"

সহসা অশ্রুর বন্যায় ঝর ঝর করিয়া অমিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। দাঁড়াইতে সে পারিল না, চূর্ণ—বিচূর্ণ—সে প্রমথর পায়ের কাছে ভাঙিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল, "তুমি জানোনা, নিষ্ঠুর,—এর চেয়েও বড় সর্ব্বনাশ হ'তে পারে।"

পাঁচ

পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া একটি বালিকা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—এমন ঘটনা প্রমথর জীবনে আর কখন ঘটে নাই। কি করিবে সে ভাবিতে পারিল না, অথচ কাহারও চোখে পড়িলে ব্যাপারটা অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়া দাঁড়াইবে, স্নতরাং তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া সে অমিয়ার হাত ধরিয়া তুলিল। বলিল, "আঃ—, অমন ক'রে কাঁদ্‌লে আমি কি কর্‌ব বুঝ্‌তে পারিনে। আমাকে নিষ্ঠুর বল্‌লে কেন শুনি?"

চোখ রগড়াইয়া অমিয়া কহিল, "মাম্‌লায় হার জিত্‌টাই তোমার কাছে বড়, আর কিছু তুমি দেখতে পেলে না। আর কারও কিছু হ'বে না, হ'তে আমারই সর্ব্বনাশ হ'বে; এ কথা তুমি একবারও ভাবলে না।"

প্রমথ কহিল, "কেন? তোমার কী ক্ষতি?"

"জানিনে।"—এই বলিয়া অমিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। তু'জনের বাড়ী একই পথে, অতএব প্রমথও তাহার পিছনে পিছনে চলিল। কিছুদূর আসিয়া সে কহিল, "তা' হ'লে তুমি কি করতে বলো, শুনি?"

অমিয়া বলিল, "তুমি যখন বুঝেও বুঝবে না, তখন তোমাকে আমি আর কোন অনুরোধ কর্‌ব না।"

প্রমথ বলিল, "তোমার সব অনুরোধই ত আমি রাখি, অমিয়া।"

"ছাই রাখো। আমি যে বলেছি জন্তীগাছের নীচে রোজ সকালে এক বার্‌টি দাঁড়াবে, তুমি তা' দাঁড়াও।"

"এ ক'দিন আমি ছিলুম না যে। আচ্ছা, এবার থেকে দাঁড়াবো। আজ তোমার কি অনুরোধ শুনি?"

বাড়ীর কাছাকাছি দু'জনেই আসিয়া পড়িয়াছে। গলা নামাইয়া অমিয়া কহিল, "মাম্‌লা-মোকর্দ্দমায় আমার বড় ভয় করে। তা' ছাড়া, বাবা বড় জেদী লোক—যা'তে সব দিক রক্ষে হয়, তোমাকে সে কাজ করতেই হ'বে।"

প্রমথ কহিল, "কোনও শাস্ত্রে একথা লেখে না। এক পক্ষের জয়, এক পক্ষের পরাজয় ঘট্‌বেই। এক যদি তোমার বাবা মিট্‌মাট্‌ কর্‌তে পারেন, তবেই মিট্‌বে—নৈলে নয়।"

"তুমিও ত মিটমাট করাতে পার।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "আরে, আমার সেই চেষ্টায় উনি রাজী হ'লেন না বলেই ত এই গণ্ডগোল।"

অমিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "আমি কিন্তু তোমাকে কোন বিপদের মধ্যে যে'তে দে'ব না, তা' বলে' রাখলুম।"

প্রমথ কহিল, "আমার জন্য তুমি অত ভাব কেন?"

অমিয়া একবার তাহার দিকে সজল নয়নে তাকাইল, কিছু বলিল না, এবং কিছু না বলিয়াই সে বাড়ীর উঠানের মধ্যে

ঢুকিতেছিল, এমন সময় গলার সাড়া পাইয়া সে চম্‌কিয়া উঠিল।

"কে ওখানে ?—কা'রা ?"

চাঁদের আলোয় দুইজনেরই ছায়া দেখা যাইতেছিল, কেহই নিজেকে গোপন করিতে পারিল না। অমিয়া গলা বাড়াইয়া কহিল, "আমি, বাবা।"

"সঙ্গে কে ?"

প্রমথ অগ্রসর হইয়া কহিল, "আমি, কাকাবাবু।"

"ওঃ—প্রমথ। 'কাকাবাবু' আর কেন, বাবা ? এখন থেকে নায়েব মশাই বলে' ডেক'। অমি, এতক্ষণ ছিলি কোথায় ?"

ভয়ে ভয়ে অমিয়া কহিল, "পিসীমাদের ওখানে।"

প্রমথ চলিয়া গেল তাহা শান্তিদয়াল দেখিলেন, এবং তারপর উষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "বলেছি না তোদের, ওদের সঙ্গে মিশ্‌বিনে। বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, লজ্জা করে না ? মা এদিকে মরে, আর উনি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন পুরুষ মানুষের সঙ্গে ! বলে' রাখ্‌লুম, আর কোন দিন বাইরে বেরোবে না, জীবনে আর ওর সঙ্গে কথা বল্‌বে না—আজ আমি শেষবার সাবধান করে দিচ্ছি। যাও ভেতরে।"

প্রমথ যতদূর গেল, এই তিরস্কারগুলি তাহার কানে বাজিতে লাগিল।

সেই রাত্রে বিছানায় শুইয়া প্রমথর চোখে ঘুম আসিল না। জানালা দিয়া জ্যোৎস্নার ঝলক্ আসিয়াছে; পূর্ব্ব দিক হইতে স্নিগ্ধ বাতাস আসিতেছিল। সে ভাবিল সংসারে আপাততঃ অভাব-অনটন তাহার নাই, নিঃসন্তানা স্মৃতি মাসীমার স্নেহের দানে ঘর তাহাদের ভরিয়া উঠিয়াছে। আসিবার সময় মাসীমা পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক সে ও মন্মথই হইবে। খুব মজার কথা এই হইল, একদা যে নিয়মে স্মৃতি দেবীর স্বামী সুধাংশুশেখর, মুখুজ্জেদের নিকট হইতে কিছু সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, ঠিক সেই নিয়মেই উক্ত সম্পত্তি পুনরায় প্রমথ ও মন্মথর নিকট ফিরিয়া আসিবে। রমাসুন্দরী এ কথা এখনও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; তিনি বলিয়াছেন, স্মৃতি দেবীর কাছে পত্রালাপ করিয়া তবে বিশ্বাস করিবেন। বিস্ময় কেবল মায়েরই নয়, প্রমথ নিজেও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের অসীম দারিদ্র্যের যে কোনদিন প্রতিকার হইতে পারে, সম্পদের চেহারা যে কখনও তাহারা দেখিতে পাইবে—ইহা সেও বিশ্বাস করে নাই। সহসা যেন একটা পরম সৌভাগ্যের সঙ্কেত তাহাদের জীবনের আকাশে রৌপ্যবর্ণে ফুটিয়া উঠিল। শান্তিদয়ালের উচ্ছিষ্ট যে আর তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাতেই সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু এই সংবাদ অতি গোপন, আর কাহারও কাছে ইহা প্রকাশ করা হইবে না।

জাগিয়া জাগিয়া জানালার বাহিরে যতদূর দৃষ্টি চলে প্রমথ দেখিল, জোৎস্নাময়ী রাত্রি কেমন যেন করুণ বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহাদের জীবনের নানাবিধ সমস্যা, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ—সমস্ত অতিক্রম করিয়া যেন একটা জটিল চিন্তা তাহার হৃদয়কে অল্পে অল্পে অধিকার করিতেছে। যেন একটা নূতন স্বাদ, নূতন কল্পনা, নূতন মোহ তাহার ভিতরে সঞ্চারিত হইয়া গেছে। শিশুকাল হইতে অমিয়াকে সে দেখিতেছে, বাল্য-কাল হইতে স্নেহের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে—তখন হইতে কলহ ছিল, কৌতুক ছিল, বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু আজিকার এই অশ্রু, এই আকুলতা, এই শাসন ও মিনতি—ইহা সম্পূর্ণ অভিনব। সেদিনকার বালিকার সহিত এই অমিয়ার কোথাও মিল নাই। যাহার সহিত কোনও বাধ্যবাধকতাই ঘটিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না, সে যেন আজ নারীর সকল দাবী লইয়া তাহার নিকট হানা দিয়াছে। অমিয়া কি তাহাকে ভালবাসে? পায়ের কাছে বসিয়া এমন করিয়া সে চোখের জল ফেলিল কেন? সে তখন বলিল যে মামলায় সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার অপেক্ষাও বড় সর্ব্বনাশ হইতে পারে। সেই সর্ব্বনাশ কেমনতর? সেই সর্ব্বনাশের ভিতরে অমিয়ার স্বার্থহানি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? অমিয়া তাহার কাছে কী চাহিল? তা হলে কী মামলা অমিয়ার প্রাণে ব্যথা দিয়েছে?

প্রমথ আর ভাবিতে পারিল না। এলোমেলো, অগোছাল চিন্তার খেই হারাইয়া সে নিঃশব্দে জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া শুইয়া রহিল। তাহার কানে শান্তিদয়ালের তিরস্কার নিরন্তর বাজিতে লাগিল—আর কোনও দিন অমিয়া বাইরে বেরোবে না, জীবনে ওর সঙ্গে আর কথা বল্‌বে না। অমিয়ার এ লাঞ্ছনা তাহারই জন্য ; তাহারই জন্য মেয়েটি মুখ বুজিয়া এই অপমান সহ্য করিল, তাহারই সম্মান বাঁচাইবার জন্য অমিয়া একটি কথারও প্রতিবাদ করিল না। প্রমথর চোখ দু'টি বেদনায় কাঁপিতে লাগিল এবং মনে মনে অমিয়ার অভিমান ভাঙাইবার জন্য সে শত রকমের আদর ও মিনতি আওড়াইতে লাগিল। অমিয়ার হাসি মুখ দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল হইল।

চার পাঁচ দিন পরে, একদিন দুপুরের দিকে প্রমথ কাগজ-পত্র লইয়া তাহার ঘরে বসিয়া উল্‌টাইতেছিল। নির্জ্জন দুপুরের মৃদু মন্দ হাওয়ায় তাহার তরুণ কল্পনা বল্‌গা হারাইয়া নিরুদ্দেশ সুদূরের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছিল ; কাগজপত্রের দিকে তাহার চোখ ছিল—মন ছিল না। সহসা পায়ের শব্দ পাইয়া সে যেন কেমন লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইল, দেখিল বই-কাগজ হাতে লইয়া মন্মথ ঘরে ঢুকিতেছে।

"এর মধ্যে স্কুল থেকে ফিরে এলি যে, মনু ?"

মন্মথ কহিল, "মা আস্‌তে বলেছিল।"

"কেন ?"

"এখনই কাকীমাকে দেখ্‌তে যা'ব আমরা। তাঁর খুব অসুখ।"

"আচ্ছা, যাও।"—বলিয়া প্রমথ কাগজপত্রের দিকে মন দিল। মাম্‌লা লইয়া সে দিন-রাত্রই ব্যাপৃত হইয়া আছে; প্রায়ই লোকজন, সাক্ষী সাবুদ, পেয়াদা আরদালী আসিয়া সেলাম দিতেছে, সেজন্য সাংসারিক সংবাদ তাহাকে জানাইবার দরকার কেহ মনে করে নাই। তবু অমিয়ার মার অসুখের সংবাদে বেদনায় তাহার হৃদয়টা টন্ টন্ করিয়া উঠিল অনেক সময় সে বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছে শান্তিদয়ালের ন্যায় স্বামীর হাতে পড়িয়াও কাকীমা তাঁহার স্বভাবের গৌরব, তাঁহার অকৃত্রিম পরার্থপরতা, তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ও বাৎসল্য—কেমন করিয়া যে রক্ষা করিয়াছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। কত দুর্দ্দিনে ও দারিদ্র্যে, গোপনে কাকীমা তাহাদের অর্থে, সামর্থ্যে, সেবায়, অকুণ্ঠ যত্নে উপকার করিয়াছেন, তাহার কথা ভাবিলে অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন। ইহা লইয়া স্বামীর সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিয়াছে, মনো-মালিন্য ঘটিয়াছে, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তিনি স্বামীর অসাধুতা বরদাস্ত করেন নাই—পরের সম্পত্তি লইয়া স্বামীর চৌর্য্যবৃত্তির বিরুদ্ধে তিনি প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কোনদিন ক্ষমা করেন নাই। ভাবিতে ভাবিতে প্রমথর দুই চক্ষু অশ্রুতে ছল্ ছল্ করিয়া আসিল।

মন্মথকে লইয়া বাহির হইবার সময় রমাসুন্দরী কহিলেন, "ছোট বৌকে একবার দেখে আসি, বাবা; এই বেলা ঠাকুরপো বাড়ী নেই।"

প্রমথ বলিল, "কিন্তু, কাকাবাবু যে আমদের যাওয়া আসা পছন্দ করেন না, মা।"

রমাসুন্দরী দীপ্তকণ্ঠে কহিলেন, "আজও আমি তাঁর মনিবের স্ত্রী, আজও আমি হুকুমে তাঁকে চালাতে পারি। আমার যাওয়া আসা বন্ধ করার বুকের পাটা তাঁর যেদিন হ'বে সেদিন বুঝব—বাবা; তোমার কোনও ভয় নেই। আয় মনু।"

মন্মথকে লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। শান্তিদয়ালের বাসা খুব দূরে নয়। তাল গাছের ডাঙ্গা পার হইয়া গেলে মুখুজ্জেদের পুরান পুকুর, তারই উত্তর দিকে শান্তিবাবুর বাড়ীর চৌহদ্দি। আগে পৈতৃক বিষয় শান্তিবাবুর ছিল না, কিন্তু তিনি জীবদ্দশায় এই গ্রামের অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড জমি আয়ত্তে আনিয়াছেন। গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠে পড়িলে তাঁহার বহু শত বিঘা ধান চালের জমি দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি তাঁহার পাটের চাষ বেশ ফাঁপিয়া উঠিয়াছে।

হরিয়া চাকরটা বাবুর সহিত পোঁট্লা পুঁট্লী লইয়া শহরে গিয়াছে, সুতরাং বাড়ীতে কেহ নাই। অমিয়া মায়ের শয্যার পাশে বসিয়া মহাভারত হইতে শান্তিপর্ব্ব পড়িয়া মাকে

শুনাইতেছিল। বাহিরে পায়ের শব্দ পাইয়া সে চুপ করিয়া গেল। রমাসুন্দরী আসিয়া ডাকিলেন, "ছোট বৌ।"

বিচ্ছেদের বেদনায় সকলেরই মনে করুণ বিষন্নতা চাপা ছিল। রমাসুন্দরীর সস্নেহ আহ্বানে সকলের চোখেই জল আসিল। কাছে আসিয়া বসিতেই শৈলবালা তাঁহার রুগ্ন হাত বাড়াইয়া রমাসুন্দরীর পায়ের ধূলা লইলেন। রমাসুন্দরী তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়া সজল চোখে কহিলেন, "তুই আমার চেয়ে কত ছোট তা' জানিস শৈল ?"—এই বলিয়া আঁচলের ভিতর হইতে কয়েকটি ফলমুল তাঁহার মাথার কাছে রাখিলেন।

শৈলবালা কহিলেন, "মরণের কি বয়েস আছে, দিদি ?"

অশ্রু গোপন করিয়া অমিয়া সহসা উঠিয়া গেল এবং বাহিরে দণ্ডায়মান মন্মথর গলা ধরিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। মন্মথ তাহার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। সে কহিল, "কান্না কেন অমিয়াদি ? অসুখ কা'র না করে বল ত ? কাকীমা ব্যাথা পাবেন ! চুপ করো, নইলে আমরা চলে' যা'ব।"

দু'জনে তাহারা বাড়ীর ভিতর দিকে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে অমিয়া বলিল—"তোমার দাদার কি খবর ? তার কি একবার আসিবার অবকাশ হইল না ! কি নিষ্ঠুর ! একটিবার দেখাও দিতে পারে না !"—এ কটা কথা

বলিয়া ফেলিয়া সে ঘামিয়া উঠিল এবং অন্য কথা পাড়িল !

শৈলবালার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে রমাসুন্দরী কহিলেন, "আজ পাঁচ মাস ছ মাস হ'ল জ্বর, খুস্‌খুসে কাসি—এর এখনও প্রতিকার হ'ল না ? কবিরাজ কি বলে রে ?"

শৈলবালা কহিলেন. "বলে আস্তে আস্তে সার্‌বে।"

"আচ্ছা, সেই যে সেবার মাল্‌দার ডাক্তার বলেছিল তোকে পশ্চিমে নিয়ে যা'বার জন্যে, তার কি হ'ল ?"

"আমি গেলে চল্‌বে কেমন করে' দিদি ?"

"তুই মারা গেলে চল্‌বে কেমন করে' রে ?"

শৈলবালা কহিলেন, "মেয়েটার বিয়ে না দিয়ে কোথায় যা'ব বল ? বয়স আঠারয় পড়ল। রায়কাঠির শশীবাবুরা পরশু দিন দেখ্‌তে এসেছিল। পাত্রও ভাল, পাত্রীও পছন্দ—কিন্তু মেয়ে কেঁদে কেটে গোল বাধাল। বল্‌লে 'মা একেবারে সেরে না উঠ্‌লে বিয়ে হবে না' এরপর কি বলব।"

রমাসুন্দরী কহিলেন, "বুদ্ধিমতি মেয়ে ঠিকই বলেছে। তুই সেরে না উঠ্‌লে বিয়ে দেবে কে ?"

উত্তরে শৈলবালা কহিলেন, "কেন দিদি, তোমরা সবাই। ছেলেরা রইল, তুমি রইলে, এই গ্রাম রইল—আমার ভাবনা কি ?"

ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে রমাসুন্দী কহিলেন, "তা' হবে না, শৈল,

ভাল তোকে হ'তেই হ'বে। ঠাকুরপো আসুন, আমি বল্‌ব মাম্‌লা-মোকর্দ্দমা পুরুষে পুরুষে হোক্‌—আমরা যা' তাই আছি। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমে কিছুদিন যা' তুই, আমি না হয় মন্মথকে সঙ্গে দিচ্ছি। তোর ঘর সংসার, তোর ছেলে মেয়ে—নিজের প্রাণ—তুই নিবি, এত নিষ্ঠুর তুই হ'বি কেন? আমি এখনও মরিনি, হুকুম করে' এখনও ঠাকুরপোকে চালাতে পারি। তিনি আসুন মাল্‌দা থেকে, আমি হুকুম করেই বল্‌ব' যে, তোকে বিদেশে নিয়ে যেতে হবে। মেয়ের বিয়ের যদি ঠিক হয় ত হোক্‌, তুই সেরে না উঠ্‌লে আমি বিয়ে দিতে দেব না—এই বলে রাখলুম।"

ছয়

রায়কাঠির শশীমোহনবাবুর পুত্র হিমাংশুর সহিত অমিয়ার বিবাহের কথা হইতেছিল। তাঁহাদের গ্রাম আট মাইল দূরে ; সেখান হইতে দুইখানা পাল্‌কী করিয়া শশীবাবুর স্ত্রী ও ভগ্নী, জন দুই বরকনদাজ, শশীবাবুর এক ভাগিনেয় এবং, তাঁহাদের বাড়ীর সরকার—ইহারা সবাই অমিয়াকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। পাত্রী দেখিতে সুন্দরী, অপছন্দ হইবার কারণ নাই—অপছন্দ হয়ও নাই। কথাবার্ত্তা কহিতে, আলাপ পরিচয় করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল ; সন্ধ্যার সময় আর তাঁহাদের ফিরিয়া যাওয়া হইল না। পরদিন সকালে জলযোগ সারিয়া, অমিয়াকে কাছে টানিয়া আদর করিয়া, তাঁহারা হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। অমিয়া আড়ালে গিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিল। এক্‌বার প্রমথকে দেখিবার জন্য তাহার মন বিচলিত হইয়া উঠিল।

শান্তিদয়াল মাম্‌লা-মোকর্দ্দমা লইয়া কিছু ব্যস্ত থাকিলেও অমিয়ার বিবাহের জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্ত্রীর শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল নয়, নিজেও বুড়া হইতে চলিয়া-ছেন। যৌবনান্তকালে বিবাহ করিয়া ঐ একটি মাত্র কন্যার উপরেই তাঁহার যাহা কিছু নির্ভরতা ; সংসারের নিকট এখন

যাহা কিছু তাঁহার বাধ্যবাধকতা আছে তাহা শেষ করিয়া তিনি মুক্তি চাহেন। আর দু' একটা বছর পার করিয়া দিতে পারিলে প্রমথ মাম্‌লা দাঁড় করাইতে পারিত না। আজ যাহা কিছু ফাঁক ও সুযোগ সে পাইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ তিনি মুছিয়া দিতে পারিতেন। যাহা হউক, প্রমথকে তিনি অল্পে ছাড়িবেন না, জাত সাপ বিষ দাঁত যদি তুলিয়াই থাকে, তবে সেই দাঁত ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। শান্তিদয়াল মনে মনে কোমর বাঁধিয়াছেন।

তাঁহার সম্পত্তি মুখুজ্জে বংশের কৃপায় সামান্য নয়। বসতবাটী, তৎসংলগ্ন কিছু জমি, কিছু ধান জমি—এই সব দিয়া প্রথম যৌবনে তাঁহাকে প্রমথর পিতা এখানে বসান, সে আজ অনেক দিনের কথা। তারপর ধীরে ধীরে সে জমি জায়গা ফলাও করিয়া তিনি বাৎসরিক উপার্জ্জন বাড়াইয়াছেন। মন্ত্রবলে ক্রমশঃ জমির পরিমাণও বাড়ীতে লাগিল, পাটের চাষ করিয়া নগদ টাকাকড়ি জমাইলেন এবং মোটা সুদে লগ্নি কারবার করিয়া অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিলেন। সে দিন তিনি ভাবেন নাই, তাঁহার এই সম্পত্তি ভোগ করিবে কে। স্ত্রী এবং শিশুকন্যা ছাড়া আর কোন নিকট আত্মীয় সেদিনও যেমন ছিল না, আজও তেমনই নাই। অবশ্য মৃত্যুর কথা ভাবিবার বয়স তাঁহার আজ হয় নাই, কিন্তু এ কথা জানিয়া-ছেন—পুত্রের মুখ তিনি আর দেখিতে পাইবেন না এবং

মৃত্যুর পরে অমিয়াই তাঁহার সকল সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। এখন বয়সের সহিত তাঁহার আগেকার পরিশ্রমের উৎসাহও কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যেমনই হউক স্ত্রীর শরীরের দিকে চাহিয়া শান্তিদয়ালের আর বিলম্ব করিতে সাহস হইল না। মালদহ হইতে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেলেন, শৈলবালাকে কিছুদিন পশ্চিমের দিকে স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাইতেই হইবে—নচেৎ এই অসুখের সুরাহা হইবে না। অসুখ কি, তাহা শান্তিদয়াল জানিতে পারিলেন, কিন্তু ঔষধপত্র ও ডাক্তারের ইঙ্গিত ইসারা লইয়া তিনি দুশ্চিন্তায় পড়িলেন।

শশীমোহনবাবুর নিকট সংবাদ গেল। তিনি এবং আরও দুই একটি ভদ্রলোক আসিয়া বিবাহের দেনা পাওনার সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিষয়ী লোক সন্দেহ নাই এবং যখন জানিতে পারিলেম, শান্তিদয়ালের অবর্ত্তমানে কন্যা ও জামাতাই সব পাইবে, তখন আর দেনাপাওনার. উপর অত্যধিক ঝোক না দিয়া তাঁহারা কাজের কথাই পাড়িলেন। ফাল্গুন মাসে হইবে না কারণ শৈলবালা শয্যাগত, বৈশাখ মাসে পাত্রের জন্ম মাস—সুতরাং জ্যৈষ্ঠমাস ছাড়া বিবাহ হইবার উপায় নাই ; অতএব জ্যৈষ্ঠমাসেই বিবাহ হইবে স্থির হইল। আশাকরা যায়, শৈলবালাও ততদিনে একটু সারিয়া উঠিবেন। আগামী রামনবমীর দিন পাকা দেখা হইবে

এইরূপ স্থির করিয়া শশীমোহনবাবুরা জলযোগ সারিয়া সেদিনকার মত উঠিয়া পড়িলেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর, ফিরিয়া আসিয়া শান্তিদয়াল দেখিলেন রমাসুন্দরী আসিয়া শৈলবালার মাথার কাছে বসিয়া আছেন। মাম্‌লা পাকিয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়াছে, সোনাপুরা হইতে মালদহ অবধি পথঘাট জয় পরাজয়ের আলোচনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে, এমন অবস্থায় শত্রুপক্ষকে বাড়ীর মধ্যে দেখিলে মনের অবস্থা কিরূপ হয়? শান্তিদয়াল মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন, সহসা পিছন হইতে রমাসুন্দরী তাঁহাকে ডাকিলেন, "ঠাকুরপো, এদিকে একবার আসুন।"

মনীবপত্নীর কণ্ঠে যে আদেশ তাহা অমান্য করিবার মত সাহস শান্তিদয়ালের নাই। তিনি নত মস্তকে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "কি বল্‌ছেন, বৌঠান্?"

"ওঁরা কি বলে' গেলেন?"

"বলে' গেলেন, রামনবমীর দিন পাকা দেখা।"

রমাসুন্দরী বলিলেন, "কিন্তু রামনবমীর দিন অমিয়া আর অমিয়ার মা ত এখানে থাক্‌বে না, তা'র আগেই ওরা বিদেশে যা'বে।"

একথাটা শান্তিদয়ালের আগে মনে হয় নাই। তিনি

কহিলেন, "কিন্তু বিদেশ যাওয়া হবে কি না, তা' ত এখনও বলতে পারিনে বৌঠান্।"

"আপনি বল্‌তে পারেন না, কিন্তু আমি পারি। বিদেশে ছোট বৌকে পাঠা'তেই হ'বে। নিজে বাঁচলে তবেই সব, নিজে না বাঁচ্‌লে কিছুরই দাম নেই। যত টাকাই লাগুক আর যেখানেই যে'তে হোক্, ছোটবৌকে ভাল ক'রে তুল্‌তেই হ'বে। এই আমার শেষ কথা।"

শান্তিদয়াল কহিলেন, "কিন্তু রামনবমীর দিন যদি পাকা দেখা না হয়, তা' হ'লে পাত্র যে হাত ছাড়া হ'য়ে যে'তে পারে, বৌঠান্।"

রমাসুন্দরী কহিলেন, "পাত্র গেলে পাত্র পাওয়া যা'বে, কিন্তু শৈলর অকাল মৃত্যু হ'লে সেটা আর ফির্‌বে না। পাত্রর জন্য ভাববেন না ঠাকুরপো, অমিয়ার মনের মতনই পাত্র আমিই ঠিক করে দেব।"

কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া শান্তিদয়াল কহিলেন, "কোথায় পাঠাব তার কোন ঠিক করিনি; আমাকে যদি সঙ্গে যে'তে হয় তা' হ'লে এদিকে সব কাজকর্ম্ম বন্ধ। টাকা অপেক্ষা সঙ্গে যাবারই লোকের অভাব।"

"মন্মথকে আমি সঙ্গে দিতে পারি।"

"মন্মথ যে ভারি ছেলেমানুষ।"

"তবে আপনিই যান, সেই ভাল হ'বে। আমি জানি

আপনি মামলার কথা ভাবছেন। কিন্তু প্রাণের আগে কী মাম্‌লা জয়? মামলা যদি চলে চলুক, তার মধ্যেই ছোট বৌয়ের ব্যবস্থা করতেই হ'বে।"

এমন সময় অমিয়া বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "যদি একজন কেউ পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে পারে, তা হ'লে আমি আর মন্নু অন্য সব ব্যবস্থা করে নিতে পারব, বাবা। আর বেশীদিন এখানে থাক্‌লে মা কিছুতেই সেরে উঠতে পার্‌বে না, এই বলে রাখলুম।"

"আচ্ছা দেখি কি হয়।"—এই বলিয়া তখনকার মত শান্তিদয়াল চলিয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন মেয়ের বিবাহটা পণ্ড করিবারই ষড়যন্ত্র দেখছি, সেটি হবে না!

রমাসুন্দরীও বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া অমিয়াকে কি যেন শিখাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

আর যখন দেরী করা চলিবে না এবং করিলে বিপদ ঘটিতে পারে তখন বিদেশে যাইবার আয়োজন চলিতে লাগিল। এদিকে কলকাঠি টিপিয়া শান্তিদয়াল মামলা মিটাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর অভিযোগ উঠিয়াছে তাহাতে মামলা মিটিয়া যাওয়া ত দূরের কথা, বরং দিনে দিনে গভীর হইতে গভীরতর রহস্য খনন করিতে করিতে চলিল। শান্তিদয়াল মনে মনে প্রমাদ গণিলেন এবং তাহার বিষয়সম্পত্তি কাহার নামে হস্তান্তর

করিবেন তাহারই সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একজন লোককে ইতিমধ্যে বিশ্বাস করিয়া একাজ করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু যে আদালতের সাহায্যে তিনি এই কাজ করিবেন সেই আদালতেই জালিয়াতীর মোকদ্দমা চলিতেছে, সুতরাং তাহা সম্ভব নহে। খৎ লিখিয়া মহাজন দাঁড় করাইয়া দেনা দেখাইবেন মনে করিলেন, নিজে দেউলিয়া বলিয়া সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিবেন কিন্তু উপরোক্ত কারণে তাহাও প্রশস্ত নয়। তিনি এখানে ওখানে ছুটিয়া বেড়াইলেন, রুগ্না স্ত্রীর সেবাশুশ্রূষার দিকেও মন দিতে পারিলেন না। ওদিকে মুখুজ্জে বংশের সিংহশাবক অচল অটল হইয়া রহিল।

আপাততঃ পাকা-দেখা স্থগিত রহিল দেখিয়া অমিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল বটে কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাহার ভয়ে ভয়ে দিন কাটিতেছিল। কখন কোন সময় শশীমোহনের বাড়ী হইতে সংবাদ আসিবে, তাহারই ভয়ে সে সর্ব্বদা উৎকন্ঠিত হইয়া রহিল। আড়ালে গিয়া সে কাঁদিল এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাইল, এ বিবাহ যেন ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার প্রাত্যহিক জীবনের কাজেকর্ম্মে, চিন্তায়, আনন্দে ও বেদনায় প্রমথ তাহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে, —সে আবার কেমন করিয়া অন্যরূপ কল্পনা করিবে? রুগ্না জননীকে লইয়া এখান হইতে সে পলাইতে পারিলে বাঁচে। মামলা মোকদ্দমা লইয়া এখন আর তাহার দুশ্চিন্তা নাই;

তাহার নিজের যে সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে, নিজের নারীধর্ম্ম যে বিপন্ন—ইহারই জন্য সে গোপনে কাঁদিয়া বেড়াইল। তাহাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই, একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিয়া বলিবার উপায় নাই, প্রমথর সহিত বাক্যালাপ করাও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ; জ্যেঠাইমাকে একথা জানাইলে হয়ত তিনিও ভীষণ কাণ্ড করিয়া বসিবেন, মাকে বলিলে তিনি কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন না—সুতরাং মুখ বুজিয়া এ জীবনের মত পিতার স্বেচ্ছাচারের নিকট আত্মসমর্পণ করা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নাই এবং পিতা যে এ ব্যাপারে কিরূপ কঠোর তাহা প্রতিদিনই সে লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে।

বিনিদ্র রাত্রে রুগ্না জননীর পাশে শুইয়া অমিয়ার দুই চোখের কোণ বাহিয়া তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া আসিল। এই বাংলাদেশে এমনই করিয়া শত সহস্র নারীহৃদয় এমনই যন্ত্রণা সহ্য করিয়াই মরিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ইতিহাস কেহ জানিতে পারে নাই। কিন্তু এই রাত্রিকালে তাহার মনে হইতে লাগিল পৃথিবীতে যত নারী যত মর্ম্মন্তুদ বেদনায় আজ অবধি জর্জ্জরিত হইয়াছে, তাহার আজিকার এই মর্ম্মদাহ তাহাদের অপেক্ষা অনেক গভীর। এই জীবনে সে সুখী হইবে না, ভালবাসিবার অধিকার তাহার থাকিবে না—কেবল চিররুগ্না ও চিরবঞ্চিতার ন্যায় আখ্যাত জীবনের আবর্জ্জনার মধ্যে থাকিয়া তাহার উৎপীড়িত প্রাণের দৃষ্টি অসীম আকাশের

একটি ধ্রুব তারার দিকে নিরন্তর চাহিয়া থাকিবে—তাহাকে পাওয়া যায় না, তাহাকে পাওয়া যাইবে না।

একখানা হাত অন্ধকারে তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িতেই সে চম্‌কাইয়া উঠিল। শৈলবালা কহিলেন, "কাঁদিস্ কেন রে অমি ?"

স্নেহের স্পর্শ পাইয়া বালিকার কান্না উচ্ছ্বসিত হইয়া ভাঙিয়া পড়িল। সে কথা বলিতে পারিল না।

শৈলবালার সন্দেহ হইল। তিনি তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "তুই ত এমন করে' কখনও কাঁদিস্ নে ? কি হয়েছে আমাকে বল্ দেখি, মা।"

অমিয়া কহিল, "আমি মরলেই ত তোমরা খুশি হও ? বেশ, আমি মর্‌ব। গলায় দড়ি না জোটে ত পুকুরে ডুবেই মর্‌ব।"

"ওমা, অর্দ্ধেক রাত্রে ও কি কথা রে ? আজ বাদে কাল বিয়ে—কত আনন্দের কথা—এখন অমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে, মা ?"

অমিয়া কহিল, "বিয়ে না চিতায় শয়ন, কখনও আমি বিয়ে কর্‌ব না।"

শৈলবালা হাসিয়া কহিলেন, "তোর মাও বিয়ে করেনি, তোর ঠাকুমাও বিয়ে করেনি—তাই তুই কর্‌বিনে, কেমন ? বিয়ে কর্‌বিনে কেন, শুনি ? পাত্র বুঝি পছন্দ হয়নি ?"

অমিয়া আর লজ্জা করিতে পারিল না। কহিল, "না, ওপাত্রকে আমি বিয়ে কর্‌ব না।"

"তবে কাকে তোর পছন্দ ?"

"জানিনে"—বলিয়া মাথা গুঁজিয়া অমিয়া মায়ের বুকের কাছে পড়িয়া রহিল।

শৈলবালা কহিলেন, "যখন জান্‌তে পারলুম্, তখন এর ব্যবস্থা আমি কর্‌ব। কিন্তু উনি মানুষ ভাল নয়; যেটা আমার পছন্দ, সেটা ওঁর পছন্দ নয়। কিন্তু তবু একথা আমি শুনে রাখলুম্। কাঁদিসনে চুপ কর।"

অবশেষে তাঁহাদের বিদেশে যাইবার ব্যবস্থা পাকা হইল। আগামী কাল তাঁহারা দেওঘর রওনা হইবেন। দেওঘর হইতে সামান্য দূরে রিখিয়া নামক গ্রামে একটি ছোটখাট বাড়ী পাওয়া গিয়াছে। শৈলবালার বড় বোনের ছেলে নরেশ সঙ্গে যাইবে। নরেশ ও তাহার নবপরিণীতা স্ত্রী অমলা রিখিয়ার বাড়ীতে অনেকদিন থাকিবে; বাড়ীটি অমলার পিতার। নরেশ তাহার মাসীমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

অমিয়া তাড়াতাড়ি গোপনে হরিয়াকে দিয়া প্রমথর নিকট একটি চিঠি পাঠাইল। চিঠিতে লিখিল,

"শ্রীচরণেষু, কাল আমরা যাইব। যাইবার আগে তোমাকে একবার দেখিয়া যাইতে চাই, প্রণাম করিব। তুমি আশীর্ব্বাদ কর' আমি যেন আবার মাকে ফিরিয়ে আন্‌তে

পারি। শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌বে। আর কোন দিন মালদহ থেকে এখানে একলা হেঁটে এস না। যদি কোন অপরাধ করে’ থাকি মার্জ্জনা করো। ইতি—তোমার চরণাশ্রিতা,

অমিয়া।”—

চিঠি লইয়া হরিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কোন জবাব আসিল না। অমিয়া স্তব্ধ হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল। বাবা অপমান করিয়াছেন, সে অপমান সে এখনও ভুলে নাই।

পরদিন জিনিষপত্র বাঁধিয়া দুইখানা পাল্‌কী আনাইয়া শান্তিদয়াল নিজেই স্ত্রী ও কন্যাকে মালদহ পৌঁছাইতে গেলেন। মনুর হাত ধরিয়া রমাসুন্দরী শৈলবালাকে সান্ত্বনা দিয়া কিছু দূর অবধি চলিলেন। পাল্কীর ভিতরে উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল অমিয়া সঙ্গীহারা হরিণীর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে চলিল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল “নিষ্ঠুর চোখের দেখাও একবার দিল না!”

—সাত—

অমিয়ার নিকট হইতে হরিয়া একখানা কি যেন চিঠি লইয়া আসিয়াছিল এবং প্রমথ তাহার কোন উত্তর দিল না, হরিয়াও নিশব্দে চলিয়া গেল—ইহা রমাসুন্দরী লক্ষ্য করিলেন। মায়ের স্নেহদৃষ্টি সন্তানের অন্তঃস্থলের পথ ধরিয়া বহুদূর অবধি চলিতে পারে, ইহা বুঝিবার বয়স প্রমথর হয় নাই, ইহাও লক্ষ্য করিয়া রমাসুন্দরী স্নেহের হাসি হাসিলেন। এই বাড়ী অমিয়ার বড় প্রিয়, এই বাড়ীতে সে তাহার শৈশব ও কৈশোরকালের সকল আনন্দ ও দুরন্তপনা করিয়াছে; এই বাড়ীর ঘর, দুয়ার, প্রাঙ্গণ ও তুলসীমঞ্চ, ঐ পুষ্করিণী ও আমবাগান—ইহাদেরই চারিদিকে দুইটি বালক ও একটি বালিকা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। শৈশবের পুতুল খেলা হইতে তরুণ বয়সের মালা গাঁথা অবধি—এই বাড়ীর প্রতি মৃত্তিকাকণার সহিত অমিয়ার প্রাণের আচ্ছেদ্য সম্পর্ক—রমাসুন্দরী সমস্তই জানিতেন। সেই শিশুকালের হৃদ্যতা আজ তরুণ যৌবনে উপনীত হইয়া যে একটা নিষ্পত্তিজনক প্রকাশের পথ খুজিয়া বেড়াইতেছে। মায়ের চক্ষুতে তাহা এড়ায় নাই। চিঠির উত্তর প্রমথ দিল না। হিমালয়ের ন্যায় অটল গম্ভীর হইয়া সে হরিয়াকে চলিয়া যাইতে বলিল,—ইহা

দেখিয়া রমাসুন্দরীর মন যেমন ক্লিষ্ট হইল, তেমনি প্রবাসে মাকে লইয়া যাইবার বিদায় কালে অমিয়ার ছুইটী বেদনা-ব্যথিত চক্ষু ব্যর্থ প্রত্যাশায় সজল ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি ভাবিলেন, এই ঘটনা শৈলবালাকে আভাষে জানাইয়া দেন ; কিন্তু অনেক বিবেচনা করিয়া নীরব হইয়া থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। অমিয়ার বিবাহের ঠিক হইয়াছে, দেনাপাওনার কথা মিটিয়াছে, পাকাদেখার দিন স্থির হইয়া গেছে—এমন অবস্থায় ছুইটি তরুণ তরুণীর চিত্তদৌর্ব্বল্য প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহা নিন্দনীয়। যাহাতে নিন্দা ভিন্ন গৌরব নাই তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া লালন করিলে পাপের ভাগী হইবে। গ্রাম্য সমাজ এই সামান্য কথা লইয়া জনশ্রুতি ও কানাকানিতে স্ফীত হইয়া উঠিবে, বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবে, শান্তিদয়াল বিপন্ন হইবেন, সরলা অমিয়ার নামে কলঙ্ক রটিবে। এই সব কল্পনা করিয়া রমাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার মনে যে মোহ্ সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার জন্য ঠাকুরের কাছে মনে মনে বারংবার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও বংশানুক্রমিক রক্ত-ধারায় যে সহজ, সুন্দর ও উদার শিক্ষা মুখুজ্জে বংশে চলিয়া আসিয়াছে, তাহারই প্রভাব পুরাপুরি প্রমথর মধ্যে ছিল। অমিয়ার চিঠি পাইয়া সে কোন উত্তর দিল না, কারণ ইহাকে

সে অন্যায় মনে করিল। যে সম্পর্ক জন সমাজ ও গুরুজনদের শুভেচ্ছার দ্বারা স্বীকৃত নহে, তাহার ভিতরে চরম কল্যাণ সে দেখিতে পাইল না। যে প্রণয় চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা দুষ্ট, যাহা আত্মগোপন করিতে করিতে আত্মগ্লানির পঙ্কে নিমজ্জিত, যাহা আপন লজ্জায় মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া আপনারই প্রাণ-শক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলে, তাহা প্রমথ অনায়াসেই বিসর্জ্জন দিবে। আগে সে জানিতে পারে নাই অমিয়ার হৃদয় তপস্বিণীর ন্যায় তাহারই দুয়ারে নিশিদিন বসিয়া আছে, যেদিন হৃদয়াবেগে আর অশ্রুজলে এই সত্য জীবনের প্রকাশ হইয়া পড়িল, সেদিন প্রমথর একটি স্মরণীয় দিন এবং সেদিন তাহার নিজের অন্তরও যে মমতায় ও অকারণ উচ্ছ্বাসিত স্নেহে অমিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাও তাহার জীবনের একটি অভিনব ঘটনা। সেই রাত্রি তাহার এক প্রকার আনন্দের তীব্র যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার চিত্তাকাশ নানা বর্ণের সমাবেশ এক বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছিল। দিনের আলো ও রাত্রির অন্ধকারের মোহ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, ইচ্ছা হইয়াছিল পথে পথে, মাঠে ও প্রান্তরে তাহার একাকী মনের আনন্দোচ্ছ্বাস বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়—কিন্তু তথাপি তাহা সাময়িক। বিচার বুদ্ধি ও চিত্ত সংযমের দ্বারায়ই নিজেকে সে সংযত করিয়া লইয়াছিল ; তাহার চিন্তার পথ ছিল সমস্যাসঙ্কুল ও জটিল

বিষয়ে জড়িত, সেখানে নিজেকে আল্‌গা করা চলিত না। সে ভাবিল এই প্রণয় ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ইহা লাঞ্ছনা ও শাসনে ভীত—ইহাতে কোন পক্ষেরই আনন্দ নাই বরং দুর্য্যোগ ও দুঃখে ইহার পরিণতি সকলের নিকটই বেদনাদায়ক হইয়া উঠিবে। প্রমথ নীরবে তাহার এই ভাবের আলোড়ন সহ্য করিয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল। কেমন একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও নিঃসঙ্গতায় তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

এদিকে মামলা মোকর্দ্দমায় শান্তিদয়াল দিনের পর দিন জড়িত হইতে লাগিলেন, এক পা তুলিতে গিয়া অন্য পা কাদায় গভীর হইয়া বসিয়া যাইবার মত অবস্থা হইল। সেদিন মামলার শুনানীর দিন ছিল এবং আদালত হইতে তাঁহার উপর আদেশ হইয়াছে যে পুরাণ খাতাপত্র, রসিদ বই, হাতচিঠা, দাখিলা, নীলামের কাগজ, খাজনাপত্রের দলিল, তাঁহার নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী সমস্তই একটি বিশেষ তারিখে কোর্টে জমা দিতে হইবে। তিনি যেন বুঝিতে পারিলেন আদালত প্রথম হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে কেমন একটা অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করিতেছেন। নাবালকের সম্পত্তি লইয়া জাল জুয়াচুরি চলিতেছে—এমনই একটা জনরব উঠিলেই হইল। দুষ্ট ব্যক্তিরা নিন্দার কথা পাইলেই মুখর হইয়া উঠে, তখন বিবাদী পক্ষে যত যুক্তি ও সততাই

থাকুক না কেন, তাহা বিশ্বাস করিবার মত লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ফলে এই হইল, শান্তিদয়াল যাঁহাদের বন্ধু মনে করিয়া অনেকটা নির্ভর করিয়াছিলেন, তাহারাই প্রমথর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া শান্তিদয়ালের বিরুদ্ধে ঘোরতর অপবাদ রটনা করিতে লাগিল। যেখানে যেখানে শান্তিদয়াল টাকা আমানত রাখিয়া ছিলেন, যে সকল খাতকের কেন্দ্র হইতে তাঁহার সুদ আদায় হয়, সেই সকল কেন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া আদালত হুকুম জাহির করিলেন যে, শান্তিদয়ালের টাকা বন্ধ করিতে হইবে এবং মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই আর তাহাকে আমানতি টাকা পরিশোধ করিতে পারিবে না। শান্তিদয়াল ইহাতে প্রমাদ গণিলেন এবং তাঁহার সমস্ত আক্রোশ, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা গিয়া গড়িল প্রমথর উপর। তাঁহার প্রতিশোধস্পৃহা ভীষণ ভাবে জাগিয়া উঠিল।

সেদিন অপরাহ্ণকালে মালদহের আদালত হইতে বাহির হইয়া সহরের উত্তর দিক্‌কার পথ ধরিয়া প্রমথ চলিতেছিল। আদালতের খাটুনি কম নয়, হিসাবপত্র ও কাগজ ঘাঁটা ঘাঁটি করিতে করিতেই এক একদিন বেলা পড়িয়া আসে; তাহার পর উকিল মোক্তারের পাওনা চুকাইয়া, আরদালিদের বক্‌শিশ দিয়া, পরের শুনানীর তদ্বির করিয়া প্রমথ যখন বাহির হইয়া আসে, তখন সে অতিশয় ক্লান্ত—খানিকক্ষণ

পথে ঘাটে না ঘুরিয়া, বায়ু সেবন না করিয়া তাহার বাড়ীর দিকে মন চলিতে চায় না। গ্রামে তাহাকে ফিরিতে হয় না, এই সুবিধা ; স্মৃতি মাসীমার শাসন ও স্নেহ অতিক্রম করিয়া তাহার পক্ষে সোনাপুরায় ফিরিয়া যাওয়াও কঠিন, তাহা সে পারে না। একটু নিরিবিলি বেড়াইবার জন্য বাগানটার দিকে চলিতেছিল।

অমিয়া যাইবার পর হইতে সে আর সংবাদ পায় নাই। প্রত্যাশা তাহার ছিল না, তবু জানিত একখানা পত্র আসিতে পারে। চিঠি না আসিলে বলিবার কিছু নাই, ক্ষতিও সে মনে করিবে না, তবু চিঠি না আসাতেও তাহার মনে মনে একটু অভিমান জমিতেছিল। সে না হয় উত্তর দেয় নাই, সে না হয় পুরুষোচিত কল্যাণ বুদ্ধিতে অমিয়ার অন্তরঙ্গতা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া অমিয়া কি তাহাকে ভুলিবে ? তাহার ভালবাসা কি এতই ক্ষণভঙ্গুর যে দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেছে বলিয়াই মনের আড়ালে চলিয়া যাইবে ? আরও সাতদিন প্রমথ অপেক্ষা করিবে, তাহার পরে নিজের সহিত তাহার বোঝাপড়া বাকী রহিল। আত্মবিস্মৃত পদক্ষেপে প্রমথ বাগানের দিকে চলিতেছিল। গলার আওয়াজ পাইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

"কি হে, প্রমথ না কি ?"

মুখ ফিরাইয়া প্রমথ দেখিল শান্তিদয়াল। কহিল, "হ্যাঁ, এই একটু যাচ্ছি বাগানের দিকে।"

"আজকাল বাগানটাগানে বেড়িয়ে বেড়াও নাকি, প্রমথ?"

প্রমথ কহিল, "পরিশ্রম গেছে খুব তাই জন্য—

"আমাকে ত মামলায় খুব জড়িয়ে ফেলেছ; কিন্তু তুমি এত খরচ করে যাচ্ছ, শেষরক্ষে কর্‌তে পারবে ত?"

যাহাকে বাল্যকাল হইতে অতিশয় সম্মান করিয়া আসিয়াছে, তাহারই বিরুদ্ধে আজ প্রতারণার মামলা দায়ের করিয়া প্রমথ অবশ্যই কিছু চক্ষুলজ্জা ও আত্মগ্লানির মধ্যে ছিল, কিন্তু তাহার তরুণ মত সহসা শান্তিদয়ালের এই শেষের কথার আঘাতে অত্যন্ত চঞ্চল ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে মাথা উঁচু করিয়া কহিল, "কাকাবাবু, আমি অন্যায় কিছু করিনি, সুতরাং সকলের সাহায্য পাব, এবং ভগবানও আমার দিকে থাকিবেন।"

শান্তিদয়াল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বাবাজি, অকাজে সাহায্যের অভাব হয় না, কিন্তু আমি বলছিলুম শেষরক্ষে হ'বে ত? এ মামলা মিট্‌বে না সহজে, কিন্তু নিজেদের অবস্থাও জান ত?"

প্রমথ কহিল, "অবস্থা জানি, তাই সেই অবস্থারই প্রতিকার করতে চাই, কাকাবাবু।"

শান্তিদয়াল হাসি থামাইলেন। বলিলেন, “একটা কথা ভেবে' অবাক হই প্রমথ, এই কাজে তোমাকে প্ররোচনা দিলে কে? অবশ্য আমার শত্রুর অভাব নেই, বুঝ্‌লে বাবাজি, অনেক নীচে থেকে উঠে এসেছি তাই অনেকের বাধা ঠেল্‌তে হয়েছে। আমার শত্রু বেশী, তাই আমার গৌরব।”

প্রমথ এই অবান্তর কথা শুনিতে চাহিল না, সে অগ্রসর হইয়া পা বাড়াইল। শান্তিদয়াল তাহার সহিত দুই পা আগাইয়া আসিয়া কহিলেন, “যাবার আগে কিন্তু একটা কথা শুনে যাও প্রমথ, ছেলে মানুষ যা' করে ফেলেছে, তা' আমি এখনও ডিস্‌মিস্‌ করাতে পারি,—কিন্তু অবাধ্য যদি হও বাবাজী, তবে ছোট ভাইটির হাত ধরে' বৌঠান্‌কেও পথে এসে দাঁড়াতে হ'বে। মামলার বানে বসতবাড়ীটুকুও যা'বে ভেসে, গরীব কাকার এই কথাটা মনে রেখো।”

প্রমথ কহিল, “যদি যায়, বুঝ্‌ব আপনার জন্যেই গেল।”

“না গিয়ে হ'বে কি বল। আমাকে পোড়াবার জন্যে চিতা জ্বলিয়েছ, সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে গেলে যে অনেক কাঠ লাগবে বাবাজী, আমার যে পাকা হাড়! আমি জানি কে তোমার খরচ যোগাচ্ছেন? সেই নচ্ছার মেয়ে মানুষটা যাকে লোকে স্মৃতিদেবী বলে থাকে। এখন সতী সেজেছেন।

এতে আশ্চর্য্য হইনি, তোমারই পিতৃপুরুষের তালুক বেনামী করে কিন্‌তে গিয়ে একদিন ওঁনি আমার কাছে ধাক্কা খেয়েছিলেন ; সেই রাগ এখনও ওঁরা ভুল্‌তে পারেন্ নি, তাই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার এই ষড়যন্ত্র।"

প্রমথ বলিল, "কিন্তু সে সব কথা এখন আলোচনা করে' লাভ নেই, কাকাবাবু ; কোন মহিলার নামে কুৎসা আমি সহ্য করিতে পারব না। আমি এখন যাই।"

"শোনো।"—শান্তিদয়াল পুনরায় তাহার পথে বাধা দিলেন। "রক্ত গরমের বয়স একদিন আমারও ছিল। অবিচার আর অন্যায় কোথাও ঘটেছে শুনলে একদিন আমিও তোমার মত ক্ষেপে উঠ্‌তুম্, কিন্তু বড় হ'য়ে জান্‌লুম অবিচার করে ভাগ্য বিধাতা—মানুষ নয় ; সে দিন চোখ মেলে চাইলুম চারিদিকে। আজ পথের মাঝখানে যখন একলাই পেলুম তোমাকে, তখন সহজ কথাটা স্পষ্ট করেই বলি। আগুনজ্বালিয়ে অগ্নিকাণ্ড দেখ্‌তে একরকম ভালই লাগে, কিন্তু সকল দিক বাঁচিয়ে চলা সংসারে কঠিন কাজ, যা'তে উভয়ের মুখ রক্ষে হয় —

প্রমথ কহিল, "কি, বলুন।"

"আদায় থাক্‌তে এই মাম্‌লা মিটিয়ে নাও বাবাজী। দুই পক্ষের গদা যদি ঘোরে তবে দুই পক্ষেরই মাথা ভাঙ্গবে, তা'তে শত্রু মিত্র উভয়েই দেবে হাত তালি। আমি বলি যা' হ'বার তা হ'য়ে গেছে, এখন—

আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, "কি ভাবে এই মাম্‌লা মেটাতে চান ?"

শান্তিদয়াল কহিলেন, "খুব সহজ, জলের মত পরিষ্কার। যে অভিমান তোমার মনে জমেছে, সেই অভিমান আমি মুছে দেব, বাবাজী।"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রমথ তাঁহার দিকে চাহিল। কহিল, "আমার দাবী কি আপনি মেটাতে রাজি ন'ন্ ?"

"বলো আর একবার তোমার দাবীটা কি ?"

প্রমথ কহিল, "মরা জমিদারের পক্ষে বেঁচে ওঠা খুব কঠিন্ সে দাবী আমি কর্‌ব না। সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে বড়লোক হ'তেও চাইনে। আমি চাই বংশের মান রাখ্‌তে এবং ছবেলা ছমুঠা খেতে! বাবার সম্পত্তির সমস্ত দলিল পত্র গুলি অগ্রে চাই।"

শান্তিদয়াল আবার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বাবাজী ডুবো জাহাজ তোলা সম্ভব হয়, যদি তার মাস্তুলের ফলাটা নজরে পড়ে। কিন্তু অগাধে তলিয়ে গেলে খোঁজাখুজিই ত সার—তখন যে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা, তা' ভেবে দেখেছ ?"

প্রমথ বলিল, "আপনার এই হিত কথা আজকে আর কেউ বিশ্বাস করবে না, কাকাবাবু। সোজা উপায়ে যদি মামলা মিটে যায় আমিই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইব! আর

হবে আপনারই কন্যা অমিয়া।" শেষ কথা কয়টা বলিতে তাহার গলা শুকাইয়া গেল ও মুখ লাল হইয়া উঠিল।

শান্তিদয়াল প্রমথর মুখে অমিয়ার নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, মনে মনে বলিলেন স্পর্দ্ধাও কম নয় এই ছোকরার! শান্তিদয়াল তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। এ জমিদারী তাহাদের অন্তঃসার শূন্য, শূন্যে তীর ছুড়িয়া কোন লাভ নাই, কেবলমাত্র আস্ফালন করিয়া কোন কিছুরই নিষ্পত্তি করা যায় না; ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশেষে বলিলেন "বিক্ষোভ প্রকাশের মধ্যে যদি যুক্তি আর কারণ না থাকে, তবে সেটা হ'য়ে ওঠে অশান্তি আর গণ্ডগোল; তা'তে কাজ হয় না বাবাজী।"

প্রমথ পুনরায় অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল। ঝুনা পণ্ডিতের কথা তাহার ভাল লাগিল না। শান্তিদয়াল কহিলেন, "সেই বেহায়া মাগি খরচ দিচ্ছে দিক্, তা'তে আমি বাধা দেব না। মামলায় যদি তুমি জিতে যাও, তা'তেও আমার কোন দুঃখ নেই।"

"দেখুন কাকাবাবু! আমায় যা খুসী হয় বলুন তাহাতে কিছু যায় না, কিন্তু পুনরায় বলছি কোন ভদ্রমহিলার অপমান আমি সহ্য করতে পারব না।"

"ভারী টস্ দেখছি যে"। একটু নরম সুরে প্রমথর কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন, "কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ, একটা

কথা বুঝতে পাচ্ছ না যে, এ মামলায় হারজিত সমানই কথা—উভয় পক্ষেরই সর্ব্বস্বান্ত হাওয়া। আমি বলি, শোন বাবাজী, আপোষে এ সব মিটিয়ে ফেল। পঞ্চায়েৎ ডাকি, সবাই মিলে সর্ত্ত ঠিক করি—সেই অনুযায়ী কাজ হ'বে।"

প্রমথ কহিল, "সোনাপুরার লোক নিয়েই কি সেই পঞ্চায়েৎ বসবে ?"

"হ্যা তা' অবশ্যই' তা'ত বটেই।" শান্তিদয়াল সাগ্রহে কহিলেন।

প্রমথর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ভাঙ্গিয়া গেছে। সে কহিল, "সেরূপ পঞ্চায়েতে আমার বিশ্বাস নেই, কাকাবাবু। মামলা যেমন চলছে চলুক।" এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

আট

মামলা মিটাইবার আগ্রহ শান্তিদয়ালের যেমন ছিল, প্রমথর তাহা অপেক্ষা কম ছিল না। অমিয়ার করুণ মিনতি তাহার মনে পড়িল, গ্রামের ভিতরকার এই ইতর বিবাদ শাখাপল্লবিত হইয়া একদা অতি কুৎসিত আকার ধারণ করিবে তাহাও প্রমথ দিনে দিনে বুঝিতে পারিতেছিল কিন্তু তৎ সত্ত্বেও মামলা চালাইয়া যাওয়া ছাড়া তাহার গত্যন্তর ছিল না। অনেকবার অনেক সূত্রে সে সংবাদ দিয়াছে যে, শান্তিদয়াল কাগজপত্র ও হিসাব নিকাশ তাহাকে বুঝাইয়া দিলে সে এই মামলার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারে, কিন্তু তিনি তাহাতে রাজী হন নাই, আজ কোন সূত্রে আপন দলভুক্ত লোক দিয়া গ্রামের পঞ্চায়েত বসাইয়া এই মামলার অসারত্ব প্রমাণ করিবার যে অপকৌশল তিনি মনে মনে ফাঁদিতেছেন, ইহা প্রমথ বেশ বুঝিতে পারিল। সে যে সংগ্রাম সুরু করিয়াছে তাহা একটা নীতির জন্য—এখানে আদর্শটাই বড় কথা, এই বিবাদ কোন ভ্রান্ত বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত নহে, এমন অবস্থায় লাভ লোকসানকে প্রধান করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। প্রমথ স্থির করিল যে, সে কিছুতেই অবনমিত হইবে না। এমন কি অমিয়ার সহিত চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ ঘটিলেও

সে এই মামলা কোন রকমেই প্রত্যাহার করিবে না। সে মন হইতে অমিয়ার মুখছবি অপসারিত করিতে মনস্থঃ করিল। কিন্তু যখনই অমিয়ার সেই মিনতি পূর্ণ আঁখি, প্রমথর নিকট নিজেকে বিলাইয়া দিবার তার আগ্রহ মনে পড়ে, তখনই আবার অমিয়ার মামলা মিটাইবার অনুরোধ চিত্তে জাগিয়া উঠে। সে যেন কোন কুল পায় না!

সোনাপুরায় ফিরিতে তাহার দুইদিন দেরী হইল। বাড়ীতে ফিরিয়া সে যখন আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রাম লইল, তখন রমাসুন্দরী তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

প্রমথ কহিল, "কাকার কথাবার্ত্তা শুনেছ, মা?"

রমাসুন্দরী হাসিমুখে বলিলেন, "শুনেছি, কেবল তোর মতটা শুন্‌তে বাকী আছে। তোর কাকা এসে যে বড় দুঃখ করছিলেন রে।"

"দুঃখ করছিলেন! তোমার কাছে?" প্রমথ চিন্তিত মুখে বলিল, "আসল যায়গায় তিনি কিছুতেই নিজের কোট ছাড়বেন না, অথচ তোমার কাছে দুঃখ জানিয়ে তাঁর লাভ কি?"

"কিন্তু তোরও ত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, বাবা।"

"কেন হ'বে না, মা? নিজের সম্পত্তিকে নিজের বলে' জান্‌তে পারব না, এমন অন্যায় ত কিছু করিনি। যখন আমাদের ঘর চলেনি, বসে' বসে' উপবাস করেছি, তখন তিনি

ত কোন সান্ত্বনা দেন নি ? তাঁর নিজের সম্পত্তি কোথা থেকে এল, তিনি লগ্নিকারবার করলেন কা'দের টাকায়, তাঁর বাৎসরিক আয় হ'ল কাদের দৌলতে ?—বলিতে বলিতে প্রমথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল।"

রমাসুন্দরী কহিলেন, "কিন্তু এই মামলায় উভয় পক্ষকেই যদি সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়, বাবা ?"

প্রমথ কহিল, "আমরা এখনই সর্ব্বস্বান্ত, সুতরাং আমাদের কোন ভয় নেই। এর চেয়েও যদি বেশী দুঃখ পাই ক্ষতি নেই, কারণ এ মামলায় আমরাই জিতবো, মা। তোমার কাছে এসে দুঃখ জানালে আমার দয়া হবে না। উনি হিসাবের কাগজপত্র ও দলিল দস্তাবেজ ফেলে দিন্, মামলা মিটিয়ে দিতে পারব। ভিতরে ভিতরে কৌশল বজায় রাখব আর বাইরে এসে কাঁদব—এ চাতুরী আমি ধরে ফেলেছি।"

"না বাবা! আমি মামলা হারের ভয় পাই না, জিতের সুখও আশা করি না, আমার কেবল ভয় ঠাকুরপোর জেদে তোর না কোন শারীরিক ক্ষতি হয়। আর ভাবি সেই অমিয়ার কথা—সে যে আমার লক্ষ্মী!"

"বাঃ! বেশত তার বাপ তোমায় সর্ব্বস্বান্ত করছে, তোমার ছেলেকে পেলে মুণ্ডুপাত করে, আর তার মেয়ে হল তোমার লক্ষ্মী! তোমাদের দরদের দৌড় দেখে হতবুদ্ধি হতে হয়।"

রমাসুন্দরী ছেলের মুখে এই কথা শুনে একটু অপ্রতিভ হইল। প্রমথর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন —"আমি যে আর এক স্বপ্ন দেখছি। সত্যিই মেয়েটি বড় লক্ষ্মী। আমাদের দুঃখে তার প্রাণ ফাটিয়া যায়, তোর কষ্টে তার যে কত ব্যাথা ! ইচ্ছা হয় তাকে—"

এই বলিয়া রমসুন্দরী গম্ভির হইয়া যাইলেন—তার চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

প্রমথ মার মুখে অমিয়ার কথা শুনিয়া যেমন প্রফুল্ল হইল তেমনই চিন্তান্বিত হইল।

গ্রামের ভিতরে ইতিমধ্যেই একটা গণ্ডগোল পাকাইয়া উঠিতেছে। কয়েকদিন ধরিয়া নানা জনে নানা কথা বলিতেছিল। এ গ্রাম হইতে সে গ্রামে কত রকমের আজগুবি জনশ্রুতি রটনা হইয়াছে। রমাসুন্দরীর কানে সমস্তই আসিয়াছে। সুতরাং মা হইয়া সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি এই আগুন নিবাইতে চাহিতেছেন। প্রমথর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বয়স হ'লেই কি মানুষের জ্ঞান হয়, বাবা ? তা হয় না। অনেক লোক বুড়া বয়সেও অজ্ঞান থাকে। তোমার কাকার মতিগতি স্থির নেই। স্ত্রীর অসুখ, মেয়ের বিয়ে ভেঙে যায়, টাকাকড়ির আয় বন্ধ, এদিকে মামলা—তাই উনি বলছিলেন যে, যাই হোক একটা আপোষে মীমাংসা ক'রে ফেলতে।"

প্রমথ বলিল, "আপোষ মীমাংসাটা কি? আমাদের কোনো দাবী মিটবে না এমন কোনো আপোষের কথায় আমরা রাজি হতে পারবো না মা, সে কথা তুমি বলো না।"

রমাসুন্দরী বলিলেন, "ঠাকুরপো বলছেন আমাদের দাবি একটু একটু ক'রে মেটাবেন।"

প্রমথ কহিল, "যাঁরা প্রবল পক্ষ তারা যখন জব্দ হয় তখন দাবী মেটাতে আসে না, আসে আপোষ করতে। আমরা আজ ওঁকে এমন এক জায়গায় চেপে ধরেছি যে, উনি আমাদের অধিকার স্বীকার করতে বাধ্য। কান্নাকাটি উনি করুন, গুজব উনি রটান, অন্যায় প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দিতে গেলে কায়েমী স্বার্থে বড় লাগে, বুঝলে মা?"

রমাসুন্দরী বলিলেন, "আমি বলছিলুম কি, ঝগড়াবিবাদ মিটিয়ে ভালো কথায় যদি কাজ হাঁসিল করা যায়।"

"পনেরো বছর ধরে তুমি ওঁকে ভালো কথা বলেছ"—প্রমথ বলিল, "ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি উনি আমাদের জীবন মরণের হর্ত্তাকর্ত্তা, ভাবতুম, উনি ভিক্ষে না দিলে বুঝি আমাদের আর দিন চলবে না, ওঁর দয়ার পথের দিকে চেয়ে থাকাই যেন আমাদের একমাত্র কাজ। একথা আমরা ভুলেই গেছি যে, উনি এসেছেন বাইরে থেকে, গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠা নিয়েছেন, আমাদের শোষণ করবার সহস্র

পথ আবিষ্কার করেছেন, আজ যদি আমরা ওর প্রাণঘাতী ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি পেতে চাই তবে সেটা কি হবে আমাদের পক্ষে এত বড় বে-আইনী ?”

রমাসুন্দরী বলিলেন,“কিন্তু একদিন যে আমরাই ওঁর হাতে সব তুলে দিয়েছিলুম বাবা ? আমরাই ডেকে এনেছি ঘরে আদর ক’রে, আমাদেরই প্রশ্রয়ে উনি শিকড় নামিয়েছেন দিনে দিনে। মনে করেছিলুম ওঁর হাতেই আমাদের পরিত্রাণ, বাহিরের নানা বিপদ থেকে উনিই আমাদের বাঁচাবেন—”

প্রমথ বলিল, “বাঁচলুম বটে, তবে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে। মা, তোমাকে স্পষ্ট জানিয়ে রাখি, সম্পত্তি জিনিষটে ভোজবাজি নয়, তার উত্থান-পতনের একটা নিজস্ব পথ আছে রীতি আছে ; নেই বললেই সবটা হঠাৎ একদিনে ফুরিয়ে যায় না। তুমি বাধা দিও না মা, মুখুয্যে-বংশের এই শোচনীয় পরিণাম কেমন করে হোলো সেই কথাটা আমাকে ভালো করে জানতে দাও। কান্নায় আজ কাকাবাবু তোমাকে ভোলাতে চান, কিন্তু ভিজে কাঁথায় ব’সে তুমি যখন চোখের জলে বর্ষার রাত কাটিয়েছ তখন উনি আমাদের কোন খবর রাখেন নি।”

পূর্ব্বস্মৃতিতে রমাসুন্দরীর চোখে জল আসিয়া পড়িল, তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

প্রমথ কহিল, “মাসিমা আজ আমাদের টাকা দিচ্ছেন

কাকাবাবু তার খোঁজ পেয়েছেন। আমি জানি গোপনে উনি সংবাদ পাঠিয়ে মিথ্যা প্রচার ক'রে সেই টাকা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা পারেননি, ভয় আর আক্রোশ তাই এত বেড়ে গেছে। যতদিন অজ্ঞান ছিলুম ততদিন ওঁকে চিনতে পারিনি, আজ যেন হঠাৎ আমার সব দৃষ্টি খুলে গেছে। ওঁর ক্ষতি কিছু আমি করব না মা, কিন্তু এই মামলায় ওঁর স্বরূপ নিজের থেকেই উদ্ঘাটিত হবে, আমার কিছু করবার দরকার নেই।"

রমাসুন্দরী আর একবার নিশ্বাস ফেলিয়া তখনকার মতো উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দুশ্চিন্তা ও সমস্যায় তাঁহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্যদিকে কেমন যেন একটা নিবিড় আনন্দ ও গৌরবে তাঁহার মাতৃবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। সেদিনকার নাবালক আজ কেবল বড়ই হইয়া উঠে নাই, কুলগৌরবকে অসম্মানের আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা সে কোনো মতেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে।

অপরাহ্নে গ্রামে হাট বসে। নানাবিধ ব্যবহারিক সামগ্রীর বেচাকেনা চলে। মন্মথর পড়াশুনার জন্য কয়েকটা জিনিষপত্র কিনিতে প্রমথ বাহির হইয়াছিল। বাজারে আসিয়া পৌঁছিতেই তাহাদের ডাকহরকরা বনমালীর সঙ্গে দেখা। বনমালী বুড়া লোক, অনেককাল হইতে এই গ্রামে

তাহার বাস। মাঝে বছর তুয়েকের জন্য সে যেন আর কোন্ মহকুমায় বদলী হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বহু চেষ্টা চরিত্রের পর সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার গায়ের রং আবলুশ কাঠের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া গ্রামের সকলেই তাহাকে 'কালোদা' বলিয়া ডাকে। বনমালী প্রমথকে দেখিতে পাইয়া আড়ালে ডাকিয়া লইল।

প্রমথ একান্তে গিয়া হাসিয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে কথা বলতেও ভয় করে কালোদা, অত চোখ লাল কেন শুনি? দিনরাত গাঁজা চলছে বুঝি?"

বনমালী হাসিমুখে কহিল, "পেটে খেতে পাইনে তাই একটু নেশা করি ভাই। শোন্ বলি আয় চুপি চুপি, গাঁজা খেলে ক্ষিধে পায় না তা জানিস্? খাবি একটু?"

"দূর"—বলিয়া প্রমথ তাহাকে একটা ঠেলা দিল।

বনমালী কহিল, "নেশা কি আর করতুম রে, তোর বাপের আমলে পেট ভ'রে খেতে পেতুম। আর কি সেদিন আছে, ওই ডাকাত চাটুয্যেই যে তোদের সর্ব্বনাশ করলে ভাই।"

প্রমথ কহিল, "তুমি আর আমাদের বাড়ী যাওনা কেন, কালোদা? আমরা খুব গরীব ব'লে?"

বনমালী কানে আঙ্গুল দিয়া কহিল, "পাপ হবে ভাই অমন গালাগাল আমাকে দিলে। যেতে আমি আজো পারি কিন্তু যেতে পারিনে ভাই। ওবাড়ীর অমন চেহারা আমি

সহ্য করতে পারিনে, ওই পথ মাড়াইনে।”—বলিতে বলিতে সহসা তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

প্রমথ তাহার গলা ধরিয়া কহিল, “কেঁদোনা কালোদা, কাঁদলে তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।”

বনমালী তাহাকে নিজের বাসায় লইয়া গেল। একটা ছেঁড়া চাটাই বাহির করিয়া দুইজনে বসিল। তারপর একটি ঝোলা হইতে দুইখানা চিঠি বাহির করিয়া একখানা প্রমথর হাতে দিল। কহিল, “পড় দেখি ভাই আমার সামনে বসে?”

কাহার চিঠি তাহা প্রমথ বুঝিল না। কিন্তু সন্দিগ্ধমনে চিঠিখানা খুলিয়া সে পড়িল। মুখখানা তাহার দেখিতে দেখিতে কঠিন হইয়া উঠিল। দেওঘর হইতে অমিয়া লিখিয়াছে:—

‘শ্রীচরণেষু

প্রমথ দা, জানি এ চিঠি দেখিলেই তুমি রাগ করিবে, কিন্তু খবর নেওয়া ও দেওয়া ছাড়া মেয়ে মানুষের মন স্থির থাকিতে পারে না। একদিন যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি আজ বাহির হইতে আঘাত আসিলেও তাহাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইতে পারিব না। আমি তোমার স্নেহের পাত্রী এই বিশ্বাস লইয়া উৎপীড়ন সহিয়া মরিব, কিন্তু তোমার সহিত কোনো সম্পর্ক নাই এই দুঃখ সহিয়া প্রাণ রাখিতে পারিব না।

ভিত কাঁচা নহে, অনেক নীচে, পুরুষ হইয়া হয়ত তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে না।

চিঠির উত্তর চাহিব না, কেবল এই সংবাদ দিব যে, মায়ের অবস্থা ভালো নহে। তিনি সেই পথেই পা বাড়াইতেছেন যে পথে তুমি এবং আমি কেহই ধরিয়া রাখিতে পারিব না। বাবাকেও পত্র দিলাম বটে, তবে মায়ের সংবাদ সঠিক জানাইলাম না। তোমাদের প্রণাম।

ইতি—অমিয়া'

কঠিন মুখ আবার দেখিতে দেখিতে কোমল হইয়া আসিল। প্রমথ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বনমালী বাংলা লেখা পড়িতে জানিত, সে অপর চিঠিখানা পড়িয়া প্রমথকে শুনাইল।

'ভাই কালোদা,

আবার তোমাকে পত্র দিতেছি। আমার আগের চিঠি পড়িয়া আশা করি সব বুঝিয়াছ। তোমার পায়ে পড়ি, প্রমথদাকে চিঠি দিতে বলিয়ো। তাঁহার চিঠি না পাইলে আর আমার দিন কিছুতেই কাটিবে না। ভালোবাসা দিয়ো। ইতি—

তোমার স্নেহের, অমিয়া।'

প্রমথর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। অনেক দুঃখেও তাহার মুখে লজ্জার হাসি আসিল, কিন্তু সে-হাসি বাহির হইল না,

মুখের কাছে আসিয়া মিলাইয়া গেল। কেবল বলিল, অমিয়ার সব ছেলেমানুষী।

বনমালী কহিল, "ওকথা কি মুখে আন্‌তে আছে ভাই, প্রাণ নিয়ে কি কেউ ছেলেমানুষী করে?"

"কি করতে হবে বলো?"

তুই পুরুষমানুষ, মাথায় আমার চেয়েও ঢ্যাঙ্গা হয়েছিস, এখনও তোকে শিখিয়ে দিতে হবে? সব জানি। বাপের সঙ্গে বিবাদ। তবু সব দিক বাঁচাতে হবে ত' ভাই? তোদের কথা কি আমি আজ জানি? জানি অনেক কাল থেকে।

বিস্মিত হইয়া প্রমথ কহিল, "জানতে তুমি এসব?"

বনমালী কহিল, "যদি নাই জানব তবে মিছেই চুল পাকলো। এই পাঁচখানা গ্রামের সকলের রান্নাঘরের ইতিহাস পর্য্যন্ত জানি। জানি বলেই ত' বাঁচতে এখনও সাধ যায়।"

"আমাকে কি চিঠি লিখতে হবে কালোদা?"

"হবে না, এক্ষুনি লেখ। ক্ষমা চেয়ে লিখতে হবে। ওরা যে মেয়ে, ওদের কাছে নীচু হয়ে থাকতেই যে আনন্দ রে? ওরা অত নিরুপায় বলেই ত ওরা অত মিষ্টি ভাই?"

অবরুদ্ধ আবেগে প্রমথের মন ভূমিকম্পের ন্যায় দুলিয়া উঠিল। বনমালীর নিকট কাগজ কলম লইয়া সে অমিয়ার

নিকট চিঠি লিখিতে বসিল। বাঁধন যতক্ষণ ছিল সে ছিল কঠিন, বাঁধন ভাঙ্গিতেই ভাবের বন্যায় তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল। চোখের জল চাপিয়া সে চিঠি লিখিয়া চলিল। পত্র দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ হইয়া গেল। লেখা শেষ করিয়া সে চারিটি পয়সা দিয়া একখানা খাম কিনিল এবং ঠিকানা লিখিয়া বনমালীর হাতে দিয়া কহিল, "যা' লিখেছি তুমি পড়ো, তোমার কাছে আমার কোনো সঙ্কোচ আর নেই, কালোদা।"

বনমালী সস্নেহে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, পড়তে হবে না দাদাভাই, কি যে লিখেছিস আমি মুখস্থ বলতে পারি। চিঠি হাতে পড়লে যদি চিঠির কথা না বুঝতে পারি ত মিছেই এতকাল চিঠি বিলি করলাম।

প্রথম একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, বনমালী ডাকিয়া কহিল, "আর শোন্ ভাই এক কথা। তোদের মামলা ঘনিয়ে উঠেছে, এখন একটু সাবধানে থাকিস। চাটুয্যে মহাশয়ের গতিবিধি ভালো না, কদিন থেকে এ-গাঁ ও-গাঁ করছে কতগুলো লোক জুটিয়ে কি যেন শলাযুক্তি করছে। আমার ভাই ভয় করে।"

নয়

স্মৃতিদেবীর বাল্যকালের নাম সৌদামিনী—যখন তিনি স্বয়ং জমিদারী দেখিয়া তাহার আয় বৃদ্ধি করিলেন ও একটি বৃহৎ অনাথ আশ্রম স্থাপন করিলেন, তখন দেশের নরনারীর শ্রদ্ধা পাইলেন। তাঁহার স্বর্গীয় শিশু পুত্রের স্মৃতি অনাথ সেবার দ্বারা রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া দেশবাসী তাহাকে 'স্মৃতিদেবী' নাম দেয়। পিত্রালয়ের দিক হইতে রমাসুন্দরীর সহিত সৌদামিনীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি সৌদামিনীর পিতৃবন্ধু ও দূর সম্পর্কীয়া এক কাকার মেয়ে। সৌদামিনীর বিবাহ হইয়াছিল অবস্থাপন্ন ঘরে ; স্বামী শিক্ষিত ও উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন। রমাসুন্দরীরও বিবাহ হইল বনেদী জমিদার বংশে। ভগ্নীরা সকলেই একান্নবর্ত্তী পরিবারেতে মানুষ—সৌদামিনী রমাসুন্দরীর ভগ্নী হইলেও সখী ছিলেন। দুই ভগ্নী একত্র থাকিলে একজন অপরের সহোদরা ছাড়া আর কিছুই মনে হইত না। বিবাহের পর বহুদিন পর্য্যন্ত পরস্পর পরস্পরের নিকট উপহার পাঠাইয়া সম্পর্ককে সজীব রাখিতেন। কিন্তু কালক্রমে সমস্তই ফিকা হইয়া আসে। সংসার করিতে করিতে পারিবারিক জীবনের নানাদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, নানাবিধ আকর্ষণ তাঁহাদের

জীবনকে বিভিন্ন পথে লইয়া চলিল। সৌদামিনীর স্বামী ভাগ্যান্বেষণে বহু কাজে লিপ্ত হইলেন এবং রমাসুন্দরীর শ্বশুরবংশে ভাঙ্গন ধরিতে লাগিল। জমিদারী একটির পর একটি নিলামে উঠিল, বিষয়সম্পত্তি ভাগ হইল; এক একটি শাখা পরিবার এক একদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অবশেষে দুইটি নাবালক লইয়া রমাসুন্দরী বিধবা হইলেন। সে আজ অনেক বছরের কথা। সৌদামিনী এসকল সংবাদ অল্পবিস্তর জানিতেন, কিন্তু পাছে ভগ্নীর নিকট সমবেদনা প্রকাশ করিলে রমাসুন্দরী ব্যথা পান সেই কারণে সৌদামিনী নীরব রহিয়া গেলেন এবং অতঃপর সংসারের বিচিত্র নিয়ম অনুসারে রাজায়-রাজায় যদিবা সাক্ষাৎ হয় দুই ভগ্নীতে আর কোনোদিন দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে নাই।

কিন্তু ভাগ্য যে পরিমাণে সুপ্রসন্ন হইল, ঠিক সেই পরিমাণেই সৌদামিনীর বাৎসল্যের ক্ষুধা দিনে দিনে বাড়ীতে লাগিল। তাঁহার একটি পুত্রসন্তান হইয়া শিশুকালেই মারা যায়, তাহার পরে আর তাঁহার সন্তান হয় নাই। কিন্তু বঞ্চিত মাতৃত্বের সেই তৃষ্ণা দিনে দিনে বৎসরের পর বৎসর তাঁহার হৃদয়ে কেবল যে তুষের আগুনই জ্বালাইয়া রাখিয়াছে তাহা নয়, সে-তৃষ্ণা যেন প্রাণের দিক দিগন্তব্যাপী একটা দীর্ঘ মরুভূমির ন্যায় নিরন্তর হা হা করিতেছিল। স্তূপাকার ঐশ্বর্য্যের স্ফীতির মধ্যে থাকিয়া সেই অবরুদ্ধ নিপীড়িত

প্রাণ অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরিয়া মরিয়াছে। ক্ষুধিত মাতৃত্বের শোকাবহ ইতিহাস বহন করিয়া এমনি ভাবেই সৌদামিনী ক্ষিণ্ণ শীর্ণ জীবন যাপন করিতেছিলেন।

এমনি দিনেই প্রমথ আসিয়া তাঁহার দরজায় দেখা দিল। মাঝখানে যেন যুগযুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, পৃথিবীর নূতন করিয়া পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রথমে কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে নাই, কারণ চিনিবার কথা কাহারও দিক হইতেই ছিল না। প্রমথ সৌদামিনীর নাম মার নিকট শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা রূপকথার ন্যায়—তাহাতে গল্প শোনার অপেক্ষা স্বপ্ন দেখাটাই ছিল বড়। সৌদামিনী জানিতেন রমাসুন্দরীর দুইটি ছেলে আছে কিন্তু তাহারা যে বড় হইয়াছে কিছু একটা আকার পাইয়াছে ইহা তিনি নির্দ্দিষ্টভাবে কল্পনা করেন নাই। সেইজন্য প্রথমটা পরস্পরকে দেখিয়া আনন্দের অপেক্ষা বিস্ময়ের মাত্রা বেশি ছিল। পরিচয় হইবার পর প্রমথকে কোলে লইয়া তিনি কাঁদিলেন। পিতৃহীন বালকের দুরবস্থা দেখিয়া কাঁদিলেন, অথবা নিজের বঞ্চিত জীবনের জন্য অশ্রুত্যাগ করিলেন তাহা বুঝা গেল না—কিন্তু অনেকখানি কাঁদিয়া তিনি হৃদয়ের ভার লঘু করিলেন। কাঁদিতে যেন তাঁহার ভালোই লাগিতেছিল, আর তাঁহার কোলে বসিয়া তরুণ যুবক প্রমথ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁর সৌদামিনী মাসিমাই আজ যে স্মৃতি দেবী।

প্রথম দর্শনের পর কিছুদিন তিনি প্রমথকে কোথাও নড়িতে দেন্ নাই। তাহাদের দুঃখের কথা, অভাব ও অপমানের কথা, সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার কথা, শান্তিদয়ালে সহিত মন-মালিন্যের কথা—সৌদামিনী একে একে সমস্তই শুনিলেন। সৌদামিনী কহিলেন তোমার মাকে বলো যে তোমাদের সব ভার আমি নিলুম, এই মামলায় যত কিছু দায়িত্ব সবই আমি বহন করবো।

প্রমথর মাথায় হাত বুলাইয়া সৌদামিনী কহিলেন, "আমি থাকিতে তোদের ভয় কি বাবা? আরো আগে এলিনে কেন রে? সব ব্যবস্থাই যে সহজে ক'রে দিতে পারতুম।"

সেইদিনই সৌদামিনী প্রচুর পরিমাণে প্রচুর খাদ্যসম্ভার ও গৃহসজ্জা গরুর গাড়ী করিয়া সোনাপুরায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই হইতে প্রমথ মাসের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক দিন আসিয়া মালদহে দেবী-গ্রামে মাসীমার কাছে থাকে।

বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাই প্রমথর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। সম্মুখে গ্রীষ্মকাল সুতরাং প্রমথর জন্য টানা-পাখা আসিল। তাহার জন্য নূতন খাট বিছানা তাহার পড়িবার ঘর, তাহার ধুতি ও জামা সুন্দর হাতঘড়ি হীরার, আংটি,—যাহা প্রয়োজন নাই তাহাও, যাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহাও আসিয়া জুটিল। প্রমথর জন্য একজন

চাকর নিযুক্ত হইল ; সৌদামিনী তাহার জন্য বিশেষ রান্না-বান্নার বন্দোবস্ত করিলেন। রমাসুন্দরীর নিকট পত্র পাঠাইয়া জানাইলেন যে, মন্মথ তোমার কাছে থাকিবে আর প্রমথ থাকিবে আমার কাছে। তোমার ছেলেকে পাইয়া আমি পুত্রহীনার দুঃখ ভুলিয়াছি। তোমার ছেলে তোমারই থাকিবে, কিন্তু আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন প্রমথকে স্নেহ করিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। রমাসুন্দরী তাহার উত্তরে হাসিমুখে লিখিলেন, 'ভাই সৌদামিনী, যে দুর্দ্দিনে তুমি আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলে তাহার তুলনা জগতে বিরল। প্রমথ এবং মন্মথ তোমার ও আমার কাহারই নহে, উহারা ঈশ্বরের। তোমাকে দান করিবার অধিকার যদি আমার থাকে তবে প্রমথকে তোমাকেই দান করিলাম।

সৌদামিনী আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যে সন্তানের অভাবে নারীর হৃদয় বাৎসল্যরসে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে সৌদামিনী সেই বয়সের প্রান্তে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, আজ সেই কারণে আপন পর বিস্মৃত হইয়া তাঁহার ব্যাকুল মন কেবলমাত্র প্রমথকে কোলে তুলিয়া লইয়াই ক্ষান্ত হইল না, অনেকটা যেন আপন প্রাণের মন্দিরে শিশু দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল। যেন বহুকাল পরে সন্তানকে ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দে তাঁহার বুকের রক্ত উত্তাল

তরঙ্গে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। জীবনে তাঁহার রুচি ছিল না, সংসারে মন ছিল না ঐশ্বর্য্যে তৃপ্তি ছিল না, পূজা পার্ব্বণে আনন্দ ছিল না—প্রমথ আসিয়া যেন তাঁহার অস্তিত্বের স্তরে স্তরে দুরন্ত প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিল। নিরাশার ভিতরে থাকিয়া দিনে দিনে তিনি মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন কিন্তু আজিকার এই নূতন স্বাদ প্রাণ ভরিয়া পাইবার জন্য আরও কিছুকাল বাঁচিতে তাঁহার সাধ হইল।

প্রমথ যেদিন সোনাপুরায় যায়, পথ পর্য্যন্ত আসিয়া সৌদামিনী তাহাকে চোখের জলে বিদায় দেন, যখন সে ফিরিয়া আসে বৎসহারা হরিণীর ন্যায় দৌড়াইয়া আসিয়া তিনি অশ্রুনয়নে তাহাকে বুকে টানিয়া ভিতরে লইয়া যান। এইভাবে একজনের আবির্ভাবে তাঁহার জীবন ফলে, ফুলে, শস্যে, সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভাগ্যদেবতার পদ প্রান্তে তিনি বারম্বার প্রণাম নিবেদন করিলেন। পথের দীনদরিদ্র ব্যক্তি স্পর্শমণি কুড়াইয়া পাইলে যেমন আনন্দে ও অশ্রুজলে তাহাকে বারম্বার নাড়াচাড়া করিয়া হৃদয়াবেগ প্রকাশ করে সৌদামিনীর ঠিক যেন তাহাই হইল। আহার ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়া সে একেবারে বাৎসল্যের সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। কিন্তু তবু মামলার কথা সে ভুলিতে পারিল না। মামলা পরিচালনের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াও মাসিমা কহিলেন,

"শান্তিদয়াল লোক ভাল নয়, ওর সঙ্গে মামলা ক'রে কি করবি বাবা ?"

প্রমথ কহিল, "আমাদের অনেক সম্পত্তি উনি বেহিসেবী ব্যবস্থায় আত্মসাৎ করেছেন, মাসিমা, আমি তার একটা কিনারা চাই। এই কারণেই মামলা।"

মাসিমা কহিলেন, "আমার অনেক আছে, এতেই তোদের চলবে বাবা। আমি বলি এই সব মামলা মোকদ্দমা ক'রে আর কাজ নেই।"

প্রমথ কহিল, "সম্পত্তি পাবার জন্যে মামলা নয় মাসিমা, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে। উনি যদি ওঁর নিজের ত্রুটি আর অপরাধ স্বীকার করেন তবে এ মামলা মিটে যায়, কিন্তু উনি তা' করবেন না। ওঁর কুব্যবস্থার জন্য যে সম্পত্তি ডুবে গেছে তা' আমি ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু যা অবশিষ্ঠ আছে তাকে ছেড়ে দোবো আমরা কোন্ যুক্তিতে মাসিমা ?"

"শান্তিদয়াল কি বলে ?"

"উনি বলেন আমাদের নাবালক অবস্থায় একটি একটি করে সব তালুক নষ্ট হয়ে গেছে।"

"তার প্রমাণ ?"

"প্রমাণ ওঁর মুখের কথা।"

মাসিমা "কহিলেন, কাগজপত্র কিছু নেই ?"

প্রমথ কহিল, "উনি বলেন নেই। কিন্তু থাকলেও উনি

দেখাবেন না এই ওঁর প্রতিজ্ঞা। আমারও প্রতিজ্ঞা আমি সব কাগজপত্র উদ্ধার করবো।”

মাসিমা চিন্তিতভাবে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, “বড়ই কঠিন কাজে হাত দেওয়া হল বাবা, বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মামলা উভয়পক্ষ সর্ব্বস্বান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই সব মামলা মেটে না।”

স্মৃতি দেবী ভাবিলেন, মুখুজ্যে বংশের ছেলে, ভয় দেখালে ও কি আর ভয় পায় ?—“প্রমথ, তুমি বাবা এই মামলা চালিয়ে যাও, আমি আছি তোমার পিছনে, যত টাকা লাগে তোমার কোনো ভাবনা নেই। শাম্ভি দয়ালকে আমিও এবার বাগে পেয়েছি, ওকে কিছুতেই অল্পে ছাড়বো না।”

সুতরাং এই মামলা চলিতে লাগিল।

যে দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া তাহাদের আশৈশব কাটিয়াছে সেই দারিদ্র্যের যে একদিন সহসা অবসান ঘটিতে পারে তাহা প্রমথ কল্পনাও করিতে পারে নাই। বিপদের দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া যে দিন সে জীবনের এক অনির্দ্দিষ্ট দুর্গম পথে যাত্রা করিল সেইদিন অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের আবির্ভাব তাহাকে বিস্ময় স্তম্ভিত করিয়া দিল। তাহাদের পরিবারের মরুভূমি যেন সহসা ফলে ফুলে শস্যে সজীব ও সতেজ হইয়া উঠিল। এখন হইতে তাহাদের আর কোনো চিন্তা নাই। রাত্রির অন্ধকারে দুর্ভাগ্যে ও দুর্য্যোগে তাহারা দিশাহারা

হইয়া পড়িয়াছিল, এখন তাহাদের জীবনে সূর্য্যোদয় হইয়াছে—অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন মুখে হাসিতেছেন। প্রমথ মনে মনে বারম্বার মাসিমাকে প্রণাম করিল।

দেবীগ্রাম হইতে সোনাপুরা মাত্র পনের মাইল পথ। কিন্তু এই পথের আর কোনো ব্যবধান রহিল না। কালের চক্রান্তে যে দুইটি ভগ্নী বহু বৎসর ধরিয়া পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল, সেই দুই সখী আবার মিলিত হইয়া উভয়কে প্রীতি ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল। সৌদামিনী তাঁহার জীবনের একটা প্রধান অবলম্বন পাইয়া যেন প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া উঠিলেন। সৌদামিনী অশ্রুবিগলিত আনন্দে সখীকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন। 'তোমার হাতে যে আমার মুক্তির মন্ত্র ছিল ইহা আগে জানিতাম না তোমার প্রমথকে পাইয়া আমার ক্ষুধাতুর মাতৃহৃদয় সার্থক ও কৃতার্থ হইয়াছে তুমি আমার সখী ও সমবয়সী হইলেও আমার প্রণাম গ্রহণ করিও।'

রমাসুন্দরী তাহার উত্তরে লিখিলেন, 'ভাই সৌদামিনী, ভাগ্যবলে তোমার দেখা পাইয়াছি। দুর্দ্দিনে শ্রীদুর্গাকে স্মরণ করিতাম তুমি তাঁরই প্রেরিত। অপমানের, বেদনার ও দারিদ্র্যের দিনে তুমি আসিয়া উদ্ধার করিলে,—তুমি আশীর্ব্বাদ করো প্রমথ ও মন্মথ যেন চিরদিন তোমার সেবা

করিয়া তোমার ঋণের কিছু অংশ শোধ করিতে পারে। তোমার করুণায় আমার ঘরে আর দারিদ্র ও অভাব নাই। তুমিও আমার ভালবাসা গ্রহণ করিও।'

প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া প্রমথ মামলাটাকে কিনারায় ভিড়াইতেছিল। সবাই বলাবলি করিতেছিল, শান্তিদয়ালের এবারে আর রক্ষা নাই, মামলায় তিনি হারিবেন এবং বিষয় সম্পত্তি স্থাবর, অস্থাবর সমস্ত বিক্রয় করিয়া প্রমথকে ক্ষতি-পূরণ দিতে হইবে। প্রমথর পক্ষের উকীল সংবাদ লইয়া জানিলেন যে হাকিম প্রমথর অনকূলেই রায় দিবেন এবং শান্তিদয়ালও হাইকোর্টে মামলা লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেন না।

তখন চৈত্র মাস। রৌদ্র শাদা হইয়াছে। সেদিন দুপুর বেলায় আদালতের কাজ সারিয়া প্রমথ যখন হাসিমুখে বাহির হইতেছিল সেই সময় সোনাপুরায় একটি লোকের নিকট হইতে খবর পাইল যে, তাহার মা দুইদিন হইতে অত্যন্ত অসুস্থ, আজ যেন সে বাড়ী যায়। প্রমথর নিকট কিছু কাগজপত্র ও অনেক নগদ টাকা ছিল। যে লোকটি তাহাকে মায়ের অসুখের সংবাদ দিল সে শান্তিদয়ালের একজন চাষী খাতক ইহা প্রমথ জানিত, কিন্তু সে এই সংবাদ অবিশ্বাস করিল না। সে এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঘোর রৌদ্রে কেহ অতদূর পথ যাইতে সাহস

করিল না। অবশেষে আদালতের এক পিওনের নিকট হইতে একখানা সাইকেল যোগাড় করিয়া প্রমথ রওনা হইল, ঘণ্টা আড়াইয়ের মধ্যেই সে পৌঁছতে পারিবে এবং সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরিয়া আসিতে পারিবে। মাসিমাকে সে আর সংবাদ দিল না। সময়ও হইল না।

দশ বারো মাইল পথ। সহর ছাড়াইয়া কাঁচা মাটির পথ দিয়া সে দ্রুতবেগে সাইকেল চালাইতেছিল। পথ নির্জ্জন মাইল তিনেক পথ আসিয়া সে দেখিল। কয়েকটি লোক দুইখানা গরুরগাড়ী পথের উপর রাখিয়া এমন ভাবেই পথ আটকাইয়াছে যে, যাইবার উপায় নাই। পাশ কাটাইয়া যাইতে হইলে ধানক্ষেতে নামিয়া জলাডোবায় ডুবিয়া পার হইতে হইবে, তাহা সম্ভব নয়, প্রমথ একজনকে গাড়ী সরাইতে বলিল। লোকটা এমন একটা বিশ্রী গালা-গালি দিয়া উঠিল যে, কোন ভদ্র সন্তান তাহা সহ্য করিতে পারে না,—প্রমথর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। উহারা বিবাদ করিতে চায় কিন্তু মায়ের অসুখ, তাহাকে তাড়াতাড়ি যাইতে হইবে। সুতরাং সাইকেল রাখিয়া নিজের হাতেই সে গাড়ী-খানা সরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যেমনই হাত দিয়াছে তৎক্ষণাৎ দুইটা লোক আসিয়া তাহাকে ঘুষি মারিল। প্রাচীন মুখুজ্জে বংশের রক্ত সিংহশাবকের বুকের ভিতরে টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। বলিষ্ঠ হাতে ধরিয়া প্রমথ সেই আঘাত

একজনকে ফিরাইয়া দিল কেবল তাহাই নয়, সেই লোকটাকে মারিতে মারিতে ধানক্ষেতে ফেলিয়া দিল। কিন্তু হইলে কি হয়, দেখিতে দেখিতে কয়েকটি লোক জড়ো হইল এবং প্রমথকে আক্রমণ করিল একা যুবক কতক্ষণ পারিবে? সকলে মিলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে করিতে রক্তাক্ত ও অচেতন অবস্থায় আনিয়া ফেলিল, এমন সময় সেই পথ দিয়া বনমালী চিঠি বিলি করিয়া মালদহের দিকে ফিরিতেছিল। সহসা প্রমথকে ওই অবস্থায় দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল এ তোমার নায়েব মশায়ের ষড়যন্ত্র, ওই দেখ দাদাভাই, তোমাদের শান্তিদয়াল—ওই যে দাঁড়িয়ে রয়েছে জঙ্গলের আড়ালে—ওই যে পালাচ্ছেন। বেশ আমি রইলুম সাক্ষী—এই বলিয়া সেও বাঘের ন্যায় আসিয়া লোকগুলার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু বৃদ্ধের শক্তি আর কতটুকু! দুই চারিটা কঠিন আঘাতেই সে রক্তাক্ত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। গ্রামের চারিদিক হইতে তখন লোকজন আসিয়া জড়ো হইয়াছে। লোকগুলি গাড়ী রাখিয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু শান্তিদয়ালের আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

প্রমথ ও বনমালী উভয়েই অচেতন। ডাকাতে তাহাদের মারিয়াছে, তাহাদের আহত দেহ গরুর গাড়ীতে তুলিয়া গ্রামের কয়েকজন লোক মালদহের দিকে চলিল। এক ঘণ্টার ভিতরে একটা মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়া গেল।

মাথা দিয়া বনমালীর রক্ত ঝরিতেছে, প্রমথর সর্ব্বদেহ ক্ষত বিক্ষত। এক একবার সে চোখ চাহিয়া মা, মাসিমা বলিতেছে আবার তখনই চোখ বুজিতেছে।

অতিকষ্টে তাহাদের সহরে আনিয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইল। সমস্ত সহরে হৈ চৈ পড়িল। সিভিল সার্জ্জেন আসিয়া বনমালী ও প্রমথর ক্ষতস্থানগুলি পরীক্ষা করিলেন। সংবাদ পাইয়া পুলিশের দল তদন্ত করিতে আসিল। দুর্ব্বৃত্ত-গণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য থানা হইতে অর্ডার লইয়া লোক ছুটিল।

বনমালীর অবস্থা সঙ্কটজনক, পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাহার বাঁচিবার আশা কম। মাথা দিয়া তাহার এমনই রক্তস্রাব হইতেছে যে, তাহার আর জ্ঞান হইবে বলিয়া মনে হয় না। পুলিশের নিকট সংবাদ পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লইতে আসিলেন। বনমালী যাহা জানিয়াছে ও দেখিয়াছে তাহা জড়িতস্বরে অল্পে অল্পে বলিয়া গেল। সে শান্তিদয়ালের ষড়যন্ত্র ও ঘটনাস্থলে তাহার উপস্থিতিও প্রকাশ করিয়া দিল। শান্তিদয়ালকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তখনই পরোয়ানা লইয়া সোনাপুরার দিকে দারোগার লোকজন ছুটিল।

রাত্রি বারোটা নাগাদ বৃদ্ধ বনমালীর কাতরকণ্ঠ নিস্তেজ হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ আগে মাত্র প্রমথর সংজ্ঞা ফিরিয়াছে,

বনমালীর মৃত্যু হইতে পারে এই সংবাদ তাহাকে দেওয়া হইল না। এদিকে স্মৃতিদেবী প্রমথ রাত্রে বাড়ি না ফেরায় চিন্তিত ওদিকে রমাসুন্দরীও কোন সংবাদ জানিতেন না। সেই রাত্রির পর যখন সকাল হইল, তখন প্রমথর অবস্থা একটু ভালো দেখা দিল বটে কিন্তু তাহার আজীবনের বন্ধু, চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও দরদী সেবক বৃদ্ধ বনমালী আর ইহজগতে রহিল না। শেষ রাত্রির ঊষাকালে রক্তিম পূর্ব্ব গগনের দিকে চাহিয়া তাহার চোখের দুইটি পাণ্ডুর তারকা চিরতরে স্থির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে শান্তিদয়ালকে সোনাপুরায় গ্রেপ্তার করা হইল। এই নিদারুন সংবাদ পাইয়া রমাসুন্দরী মন্মথকে সঙ্গে লইয়া গরুর গাড়ীতে করিয়া মালদহে আসিয়া পৌঁছিলেন। হাসপাতালে পৌঁছিতে বেলা বারোটা বাজিল।

হাসপাতালের কক্ষে ঢুকিয়া দেখিলেন স্মৃতিদেবী ও তাঁহার বাড়ীর লোকজন সকলে বসিয়া কাঁদিতেছেন। উন্মাদিনীর ন্যায় রমাসুন্দরী আসিয়া প্রমথর পাশে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষে অশ্রু নাই, বরং সেই চক্ষু হইতে আগুন ঠিকরিয়া বাহির হইতেছে। দু'তিনজন ডাক্তার ও পুলিশের লোক ঘটনার বিবরণ দিয়া জানাইল, এখন আর ভয় নাই, তবে সুস্থ হইয়া উঠিতে কিছু বিলম্ব হইবে। ইহাও তাঁহারা জানিতে পারিলেন, বনমালী জীবন দিয়া তাঁহাদের সন্তানকে রক্ষা করিয়া গেছে।

মন্মথ কাছে বসিয়া কাঁদিতেছিল, প্রমথ ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি সস্নেহে টানিয়া লইল। তাহার মাথায় ও পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, শরীর অতিশয় আড়ষ্ট ও দুর্ব্বল,—ক্ষীণস্বরে সে কি যেন বলিল তাহা বুঝা গেল না। রমাসুন্দরী স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ও শরীর কি একটা কঠিন আঘাতে অবশ হইয়া আসিতেছিল। পাশে খাটের খুটিতে মাথা হেলান দিয়া সৌদামিনী অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন, মাঝে মাঝে একজন ডাক্তার ও নার্সের মধ্যে কি যেন পরামার্শ চলিতেছিল।

এইভাবে দুইদিন প্রমথকে হাসপাতালে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকিতে হইল। তৃতীয় দিনও ডাক্তাররা ও হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ রোগীকে ছাড়িতে চাহিল না কিন্তু মাসিমার পীড়াপীড়িতে ও রমাসুন্দরীর বিশেষ আগ্রহে স্মৃতিদেবীর ম্যানেজার সিভিল সার্জ্জেনের হুকুমে প্রমথকে হাঁসপাতাল নিজের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় লইয়া গেলেন। রোগীর দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করিলেন।

স্মৃতিদেবীর গৃহে রমাসুন্দরী এই প্রথম পদার্পণ করিলেন। দাস-দাসী, দারোয়ান, ঠাকুর ও বাহিরের লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ। সুসজ্জিত ঘরগুলি ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যের সঙ্কেত জানাইতেছে। ভিতরে গিয়া দোতলায় উঠিয়া রমাসুন্দরী দক্ষিণদিককার মহলে ঢুকিলেন। এই দিকটা বাড়ীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

অংশ এবং এই দিকটি প্রমথর জন্য সংরক্ষিত। তাহার বসিবার ঘর, তাহার পড়িবার ঘর, তাহার পায়চারির বারান্দা, তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাথরুম—তার মাসীমা কিছুরই অভাব রাখেন নাই। স্মৃতির আনাথ আশ্রমও তাহাকে মুগ্ধ করিল।

কথায় কথায় রমাসুন্দরী যখন জানাইলেন যে প্রমথ ভালো হইলে তাহাকে লইয়া তিনি সোনাপুরায় ফিরিয়া যাইবেন তখন স্মৃতিদেবী আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "একপাও আর তোমাকে নড়তে দেবোনা ভাই এই তোমার বাড়ী, এই তোমার ঘর, তোমার ছেলেদের নিয়ে তুমি থাকো আমাকে মুক্তি দাও ভাই। আমি কাশীবাসী হই।"

রমাসুন্দরী হাসিমুখে কহিলেন,"তাই কি হয় ভাই, শ্বশুরের ভিটে—কুঁড়ে ঘর হলেও সেই যে আমার স্বর্গ বোন্!"

স্মৃতিদেবী কহিলেন, "স্বর্গ! তোমার স্বর্গ তোমারিই থাক বোন, কিন্তু আমরা দুই নদী গিয়েছিলুম দু'দিকে, যদি আজ আবার একত্র মিলে থাকি তবে তুমি ছাড়িয়ে যাবে কি ক'রে ভাই?"

রমাসুন্দরী সম্পূর্ণ রাজি হইতে পারিলেন না, কারণ এইরূপ প্রস্তাবে রাজি হওয়ার মধ্যে একটি গভীর লজ্জা ও সঙ্কোচের প্রশ্ন ছিল। দান যে করে সে মুক্তি পায়, কিন্তু সেই দান গ্রহণ যে করে সে কৃপার ভার বহন করিয়া চলে। রমাসুন্দরী কেবল হাসিমুখে কহিলেন, "আচ্ছা সেত' পরের কথা, আগে তোমার ছেলে ভালো হোক্, ভাই!"

অবশেষে ইহাই স্থির হইল স্মৃতি প্রমথর স্নেহ যত্নর ভার গ্রহণ কবিবেন এবং রমাসুন্দরী লইবেন এই বাড়ীর সংসারের দায়িত্ব। কিন্তু সেই দায়িত্ব লইবার পূর্ব্বে রমাসুন্দরীকে কয়েক দিনের জন্য একবার সোনাপুরায় যাইতে হইবে। বাড়ীর দরোয়ান একখানা মোটর আনিয়া হাজির করিল— বড়মা যাইবেন বলিয়া; সোনাপুরায় বাড়ীর একটা অস্থায়ী বিলিব্যবস্থা ও অন্যান্য কাজকর্ম্মগুলির একটা যাহোক বন্দোবস্ত করিয়া আসিবার জন্য রমাসুন্দরী দুইজন চাকর ও মন্মথকে সঙ্গে লইয়া মোটরে করিয়া রওনা হইয়া গেলেন।

* * * *

আজ শান্তিদয়ালের পাশে দাঁড়াইবার মতো বন্ধু কেহ নাই। রুগ্না স্ত্রী কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত, কন্যাও মাতার সহিত প্রবাসে। যাহারা খাতক, যাহারা তাঁহার আশ্রিত— তাহারাও ফৌজদারি মামলা দেখিয়া ভয় পাইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আজ তাঁহার বাড়ীতে তালাবন্ধ। তিনি যে কেবল ডাকাতির মামলায় ধরা পড়িয়াছেন তাহাই নয়, একটি বালককে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিবার দলপতি হিসাবেও তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ এতদূর প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে যে হাকিম তাঁহাকে জামিন পর্য্যন্ত দিতে

স্বীকৃত হন্ নাই। সকলেই জানিয়াছে যে, খুব কম হইলেও তাঁহাকে পাঁচ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হইবে। সোনাপুরায় শান্তিদয়ালের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া সরকারী তালা পড়িয়াছে, সেখানে আর সন্ধ্যার বাতি দিবার কেহ লোক নাই। হরিয়া চাকরটা ছিল কিন্তু সেও দেশে পলাইয়াছে। সম্প্রতি পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে, আর শান্তিদয়াল হাজতে আবদ্ধ আছে। তাঁহার পক্ষে কোনো উকীল দাঁড়াইতে সাহস পাইতেছে না, পাছে সেই উকীল সামাজিকভাবে 'একঘরে' হন্। এক পাথরের দেয়াল-ঘেরা অন্ধকার কক্ষের বিষাক্ত আবহাওয়ায় একাকী বসিয়া শান্তিদয়াল নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছেন,—আর সেই অশ্রু মুছাইয়া দিবার সঙ্গী আজ তাঁহার কেহ নাই। শান্তি-দয়ালের কু-চরিত্রর কথা শুনিয়া রায়কাটির শশীবাবু অমিয়ার সহিত তাঁহার পুত্রর বিবাহ কথা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। মানুষের জীবন এমনি বিচিত্র বটে !

*　　　*　　　*　　　*

প্রমথর শরীর সারিয়া আসিল। যত্নে ও সেবায় প্রমথ আজ কয়েকদিন সুস্থ বোধ করিতেছে,এখন সে চলিতে ফিরিতে পারে। রমাসুন্দরী আর একবার সোনাপুরায় যাইবার জন্য কথা পাড়িলেন। স্মৃতিদেবী কয়েকদিন ধরিয়া কি কাজে যেন লিপ্ত ছিলেন। রমাসুন্দরীর প্রস্তাব শুনিয়া তিনি

ম্যানেজারকে লইয়া আফিস ঘরে ঢুকিলেন। মন্মথ ঘরের একপাশে বসিয়া ছিল।

রমাসুন্দরী প্রমথর কাছে আসিয়া বসিলেন, বলিলেন, "ভালো হয়ে উঠে এবার শান্তিদয়ালের বিপক্ষে মামলা তুলে নেবেত বাবা? অনেক শাস্তি সে পেয়েছে ঈশ্বর তাকে মেরেছেন।"

প্রমথর হৃদে তখন অমিয়ার মুখ ভাসিয়া উঠিল, তাহার করুণ চোখ দুইটীতে প্রমথকে পাইবার আগ্রহ, অমিয়ার প্রমথর হিত চিন্তা ও সাবধান বাণী প্রমথর মনকে সরস করিল। অমিয়াকে তাঁর সুখের কথা বলিবার জন্য তার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তাই প্রমথ রাজি হইল। আর সে মামলা করিবে না।

স্মৃতিদেবী ম্যানেজারের হাত হইতে একখানা দলিল লইয়া কহিলেন, 'ভাই রমা দিদি, তোমাকে দান ক'রে তোমার সম্মানকে ছোট করব না, কিন্তু আমাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আজ প্রমথ আর মন্মথর নামে লিখে দিলুম। এও আমাদের দান নয়, এ হোলো ওদের মায়ের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। এখন ত তুমি এখানে নিজের বাটীর মতন থাকিতে পারিবে।'

—দশ—

সাঁওতাল পরগণার প্রান্তরে প্রান্তরে বসন্তকাল প্রায় শেষ হইতে চলিল। রাঙ্গা মাটির পথে পথে যে সব নামহারা ফুল মাঘের শেষে দেখা দিয়াছিল তাহারা শুকাইয়া আসিয়াছে। অতি প্রত্যুষে অল্প স্বল্প শিশির বিন্দু মাঠে মাঠে ঝিকমিক করিয়া ওঠে, কিন্তু প্রভাতের সূর্য্য রাঙা হইয়া উঠিলেই তাহারা শুকাইয়া যায়। শাল, পলাশ আর মহুয়ায় এখন আর প্রত্যহ ফুল ধরে না, এখন অবসন্ন বসন্তের বিদায় কাল, ঋতুরাজের অভ্যর্থনা শেষ হইয়া গেছে।

সকাল নয়টার পরে রিখিয়ার মাঠে আর চলা যায় না। প্রভাতে অমিয়া এক একদিন নিজের খুসিতে ভ্রমণে বাহির হয়, কিন্তু মায়ের কথা ভাবিয়া বেশিদূর যাইতে ভরসা হয় না, কতগুলি ফুল এখান ওখান হইতে সংগ্রহ করিয়া সে ফিরিয়া আসে। চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে বড় বড় গোলাপ ফুল ফোটে, ওই ফুলগুলির দিকে তাহার আকর্ষণ একটু বেশি। সুতরাং ফুল ফুটিলেই চৌধুরী সাহেবের ছোট বোন জোর করিয়া অমিয়ার হাতে একটি গুজিয়া দেন্। তাহাদের নিজেদের বাংলোয় ফোটে বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা— কিন্তু এখন আর সে-ফুলে জৌলস নাই। কুঁড়ি ধরাও বন্ধ

হইয়া গেছে। অমিয়া গাছগুলির দিকে তাকাইয়া নিশ্বাস ফেলে। জীবনের চেহারাও এমনি—কখনও সেখানে জোয়ার, কখনও ভাঁটা। যত বড় প্রিয়বস্তুই হোক, সময় হইলেই একদিন ছাড়িতেই হইবে।

রিখিয়ার মাঠের উপর মধ্যাহ্ন আকাশে সূর্য্যের জ্বলজ্বালায় যে আতাম্র পাণ্ডুরতা চোখে পড়ে, সেইদিকে চাহিলে চোখ জ্বালা করে। কিন্তু বাংলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহাকে চাহিয়া থাকিতেই হয়—এই সময়টা ডাক ঘর হইতে লোক আসে। কিন্তু দিনের পর দিন অমনি করিয়া সে অপেক্ষায় থাকে, ডাকঘরের লোক সব বাড়ী ঘুরিয়া চলিয়া যায়, নরেশের স্ত্রীর নামে চিঠি আসে—কিন্তু তাহার চিঠি আসিয়া পৌঁছে না। অমিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শূন্য প্রান্তরের উপর দিয়া শেষ বসন্তের উতপ্ত বায়ুর ঝলক তাহার মুখে চোখে আসিয়া লাগে,—এইভাবে দিনের পর দিন।

গরম পড়িতে পড়িতেই আশপাশের প্রতিবেশীরা অনেকেই চলিয়া গেছে। দুচারটি পরিবার যাহারা আছে তাহারাও যাই যাই করিতেছে। পেন্সন লইয়া দুতিনটি বৃদ্ধ এখানেই স্থায়ী বাসা করিয়া আছেন, কেবল তাহারাই থাকিবেন। গ্রামটি ছোট, মধ্যে মাঝে হাট বসে। জিনিসপত্র দুর্মূল্য, তাছাড়া গ্রীষ্মকালে আনাজ তরকারী ফল মূল এবং অন্যান্য আহারাদি বিশেষ পাওয়া যায় না, নদীতে মাছও কমিয়া যায়।

দেওঘর হইতে বাজার হাট না করিলে সংসার চলে না। সহর এখান হইতে চার পাঁচ মাইলের পথ।

শৈলবালার অবস্থা ভালো নহে, কিন্তু দেশে ফিরিয়া গেলে অবস্থা আরও খারাপ হইবে—চিকিৎসকের এই মন্তব্য শুনিয়া অমিয়া আর দেশের কথা মুখে আনিতে সাহস করে নাই। মায়ের সেবাযত্নের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া তাহার দিবারাত্রি গভীর উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় কাটিয়া যায়। বাসায় ঝি, চাকর ও রাঁধিবার লোক আছে, সাংসারিক কাজকর্ম্মের কোনো অসুবিধা নাই। আসিবার সময় শান্তিদয়াল খরচপত্র যাহা দিয়াছিলেন তাহাই পর্য্যাপ্ত, সুতরাং অর্থের অভাবও শীঘ্র ঘটিবে না। সেদিক হইতে অমিয়ার কোনো দুশ্চিন্তা নাই।

শৈলবালার জ্বর সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য জ্বর তুষের আগুনের ন্যায় তাঁহাকে অবিশ্রান্ত দগ্ধ করিয়া মারিতেছে। দেওঘরের ডাক্তার নানা কথা বলেন, সকল কথা বুঝা যায় না। এক্স-রে হইয়াছে, রক্ত পরীক্ষা হইয়াছে, ইন্‌জেকশন চলিতেছে, নানারূপ ঔষধপত্র খাওয়ানো হইতেছে—কিন্তু এখনও অনেক দিন লাগিবে। শরীরের একদিকটায় জলভর করিয়াছিল, সেই জল বাহির করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার বেশি আর কোনো চিকিৎসা নাই, চিকিৎসাশাস্ত্রে এই কথাই বলে। অমিয়া নীরবে সুশৃঙ্খলায় মায়ের সেবায় দিনযাপন করে।

তাহার গায়ের রং একটু কালো হইয়াছে, চেহারাটা কিছু শীর্ণ কিন্তু অযত্নে আলুথালু। মুখে চোখে কেমন একটা বৈরাগ্য বিষাদ, যেন কিছুতেই তাহার প্রাণস্পর্শ করে না। তাহাকে দেখিলেই মনে হয় সদাসর্ব্বদা নিজের ভিতরেই যেন সে চাহিয়া আছে। চোখ দুইটা বড় বড়, বিলোল দুইটি দৃষ্টি —অনেক সময় মনে হয় অর্থহীন, অনেক সময় দেখা যায়, কী যেন গভীর অর্থে ভরা। নরেশ ইহা দেখিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে সস্নেহে তিরস্কার করে, অমলা কখনো কখনো তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, "এমনি করে শরীর নষ্ট করো না ভাই, লক্ষ্মীটি। আয়নার দিকে চেয়ে দেখো দেখি, কী ছিরি হয়েছে ?"

শীর্ণ হাসিয়া অমিয়া বলে, "তোমার কেবল ওই এক কথা বৌদি,এখানে এসে খাওয়ার পরিমাণ কত বেড়েছে তা জানো ?"

কিন্তু হাসিতে গিয়া হঠাৎ কান্না চাপিয়া সে অমলার কণ্ঠালিঙ্গনের মধ্যে মুখ লুকায়। এক সময় মৃদুস্বরে সে বলে, "আচ্ছা বৌদিদি, চিঠি কি ওরা কেউ দেবে না ?"

অমলা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলে, "ভালোই আছে, তাই চিঠি দেয় না। বোধ হয় মামলাটা খুব বেশি রকম ফেনিয়ে উঠেছে।"

"মামলা ছাড়া দুনিয়াতে আর কিছু কাহার খবর দেওয়া বা লওয়া প্রয়োজন নাই অমলা দিদি ?"

"ও বুঝিছি, তাই বুঝি ভেবে ভেবে এমন চেহারা করেছিস, ওরে প্রেম কি এমন সহজে জমে—অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়। অনেক যাতনা ভোগ করতে হয়। ধন্য তুই, যে তোদের পরম শত্রু তারই মঙ্গল চিন্তা তোর চিত্তে সদাই জাগে।"

কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন অমিয়া করে না। সে নিজের কাজে চলিয়া যায়। এক জনেরই ভাবনা সে কেবল ভাবে।

অথচ মায়ের সেবা করিয়াও দীর্ঘ দিন তাহার কাটিতে চায় না। কেমন একটা প্রচ্ছন্ন অবসাদ তাহার সর্ব্বশরীরকে ঘিরিয়া যেন কাঁদিতে থাকে। শৈলবালাও যেন অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া ইদানীং কিছু খিটখিটে হইয়াছেন। অনেক সময় কন্যাকে তিনি দূরে সরিয়া যাইতে বলেন। কয়েকদিন আগে এইখানেই কোথায় একজন সাধু আসিয়াছিল, লোকটি ভালো গীতার ব্যাখ্যা করিতে পারিত। অমলাকে সঙ্গে লইয়া তাহারই ওখানে বিকালের দিকে গিয়া কয়েকদিন বেশ কাটিল।

স্বামিজী একদিন অমিয়ার বিষণ্ণ মন লক্ষ্য করিয়া বলিল—"দিদি, দুঃখ করনা—মনের আশা শীঘ্র পুরণ হবে। ভগবানের শরণ লও, মেঘ কেটে যাবে"

স্বামীজীর এই কথায় অমিয়ার মন প্রফুল্ল হইল, কিন্তু সে আশা কুহেলিকা মনে হইতে লাগিল। তথাপি স্বামিজীর

নিকট প্রত্যহই যাবার জন্য মন আকুল হইত। ভক্তি ভরে তাঁহার গীতার ব্যাখ্যা শুনিত।

সেই স্বামীজি চলিয়া যাইবার পর আর নূতন কোনো আকর্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন আবার অমলার সহিত সে দারোয়া নদী অবধি বেড়াইতে বাহির হইত। নদীতে জল আর নাই বলিলেই হয়, একটি অতি শীর্ণ ধারা চৈত্রের শেষে তখনও ঝিরঝির করিতেছে। বালুর চরে পাখীর দল আর আসিয়া বসে না। কাঁটালতা আর শৈবালে আচ্ছন্ন হইয়া দারোয়ার আবদ্ধ জলধারা অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে দেখিতে সেই নদীর আকর্ষণও ফুরাইয়া গেল।

আজ কয়দিনই হল অমিয়ার মন চঞ্চল হইয়া আছে, বাড়িতে সে স্থির হয়ে থাকতে পারছে না। সকালে মার সেবা যত্ন করে রান্নার কাজ সব শেষ হলে অমিয়া প্রায় জনবিরল রাস্তার ধারে বাঁধান বট গাছের তলায় একা বসিয়া, কত কি ভাবে। একদিন সকাল দশটার সময় অমিয়া যখন বসিয়া বসিয়া সোনারপুরের, তাহার প্রিয় জন্তি গাছের, ও প্রমথর কথা ভাবিতেছিল, তখন এক ভিখারী আসিয়া একটী পয়সা চাহিল। অমিয়া অন্যমনাভাবে পয়সা নাই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

ভিখারী যখন কাতর স্বরে আবার চাহিল "দিদিমণি একটী পয়সা" অমিয়া তখন তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল,

এক কমনীয় বড় ঘরের দুলাল যেন সংসারের জ্বালায় তিক্ত হইয়া বা ব্যর্থ মনোরথ লইয়া এই ভিখারী তপস্বীর বেশ গ্রহণ করিয়াছে। অমিয়ার সেই ভাবাক্রান্ত মন আরো চিন্তিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—"মাপ করবেন, আমার এখন ভিক্ষা দেবার অবস্থা নহে"—

ভিখারী দূরে চলিয়া যাইয়া এক গাছতলায় বসিয়া আপন মনে সুমধুর সুরে গাহিতে লাগিল—

আজি মোর সকল পুঁজি
খুঁজি খুঁজি দিন কাটিল।
এমনি কাটবে দিবা,
কর'বো কিবা,
মায়ার ডোরে কে বাঁধিল॥

হৃদয়ে কে জাগলো,
বুঝিবা আঁধার কালো
আমার এ ভুবনটারে ভরে দিল॥

আজিকে সব মনোরথ,
হারায় যে পথ,
চরম ক্ষণে পথ ভুলিল॥

আমার এ পরাণখানি,
হারানো সকল বাণী
বীণারি তারে তারে সুর ভাঙ্গিল ।

মরণের বেদন সাথী,
চলিব দিবস রাতি
নবীন আশা বুঝি হিয়ারে সঞ্চারিল ॥

গান শুনিয়া অমিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভিখারীর দিকে অগ্রসর হইল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "এমন সুন্দর গান কে তোমায় শেখাল।" ভিখারী সলজ্জ ভাবে বলিল "আপনা আপনি শিখিয়াছি, আজকাল আবার গান শেখবার জন্য কি ওস্তাদের বাড়ি যেতে হয়, রাস্তা ঘাটে গ্রামাফোন্ ও রেডিওর কল্যাণে গান শুনিবার এবং শিখিবার কি ভাবনা আছে!"

অমিয়া বলিল—"আমি এমন গান কখন শুনিনি।"

ভিখারী কহিল—"গানটা বুঝি রবীন্দ্রনাথের, সুর দিয়েছে পঙ্কজ মল্লিক।"

অমিয়া বলিল, "আপনি বেশ গুণিজন, হাঁ একটী পয়সা চাচ্ছিলেন, এই নিন আনিটা, পয়সা ত সঙ্গে নাই।"

এই বলিয়া অমিয়া ভিখারীর হাতে আনিটী দিতে যাইয়া

তাহার মুখের উপর চোখ রাখিতেই, সমস্ত মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল নিশ্চয় এ ছদ্মবেশী কোন লোক। শঙ্কিত চিত্তে বাড়ির দিকে চলিল। গানের ভাব তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে আর কিছু ভাবিতে তার মন চায় না। কেবলই কবে প্রমথর সহিত তাহার আবার দেখা হবে, প্রমথর শরীর ভাল আছে কি ?—রাতদিন এই ভাবে।

ইতিমধ্যে অমিয়া বনমালীকে তুইখানা ও প্রমথকে একখানা চিঠি লিখিল। কিন্তু সেই যে বনমালী প্রমথর একখানি মধুমাখা পত্র পাঠাইয়াছিল তাহার পর আর কোন খবর নাই। সেই পত্রখানি অমিয়ার প্রাণের বেদনার প্রলেপ।

অমিয়া মনে মনে ভাবে তাহা হইলে প্রমথদা কি বাবার সহিত শত্রুতা পাকাইয়া তুলিয়া আমায় দূরে রাখিবার জন্য এই কৌশল করিয়াছে। তাহাত তার মুখ দেখিলে. মনে হয় না, সেদিনকার তাহার কাতর চহনি আমার চিত্ত ত তেমনই হরণ করিয়াছিল। তা নয়—সে বড় লাজুক তাই বুঝি সে কিছু প্রকাশ করিতে পারে না।

শৈলবালা একদিন কহিলেন, "এঁদের কাছ থেকেও কি কোনো খবর এলো না ?"

"বাবার কথা বলছ, মা ?"

"হ্যাঁরে।"

মুখের একটা শব্দ করিয়া হাসিয়া অমিয়া, "কহিল, তবেই হয়েছে। তিনি ত আর বুড়োবয়সে বিয়ে করেননি যে দিনরাত চিঠি দেবেন। তোমাকে বাবা ভুলেই গেছেন।"

"আ পোড়ার মুখি।"—বলিয়া শৈলবালা অত দুঃখেও হাসিলেন। "বলিলেন, চোতের কিস্তি নিয়ে খুবই ব্যস্ত বুঝতে পারছি।"

চৌধুরী সাহেবের ভগ্নী ললিতাদেবী দেওঘরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিতে বাহির হইবেন। তিনি আসিয়া শৈলবালাকে ধরিলেন, অমিয়াকে সঙ্গে দিতে হইবে। তাঁহার সঙ্গে মোটর ও লোকজন আছে। চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা এদিকে নন্দন পাহাড় ও ওদিকে বালানন্দ আশ্রম ও ত্রিকূট ইত্যাদি সারিয়া আসিবেন। আগামীকাল ভোর ছয়টায় বাহির হইবেন। শৈল রাজি হইলেন।

পরের দিন ভোর পাঁচটাতেই অমিয়াদের বাংলার কাছে মোটরের হর্ণ বাজিল। তাহার অনেক আগেই উঠিয়া মায়ের সকল কাজ শেষ করিয়া অমিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। আকাশের শেষ তারকাটি তখনও মিলায় নাই, ভোরের বাতাস স্নিগ্ধমৃদু স্পর্শ বুলাইয়া চলিয়াছে। প্রভাতী পাখীর বন্দনা গানে ধীরে ধীরে উষার ঘুম ভাঙিতেছিল। অমিয়া বাহির হইয়া আসিতেই ললিতা তাহাকে সাদরে গাড়ীতে তুলিয়া লইল।

অল্পদিনেই অমিয়ার সহিত ললিতার বন্ধুত্ব জমিয়াছে। অমিয়া তাই আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছে "ললিতাসখী।"

ভোরের বাতাসের ভিতর দিয়া তুইধারের প্রান্তরের পথ কাটিয়া মোটর দেওঘরের দিকে ছুটিল। গাড়ীর জন্য কিছু পেট্রল লইয়া তাহাদের যাইতে হইবে। গলা জড়াইয়া ললিতা কহিল, "খবর কিছু আসেনি ভাই ?"

অমিয়া কহিল, "কি খবর চাও বলো ?"

তাহার চিবুক নাড়িয়া দিয়া ললিতা কহিল, "তোমার বন্ধু প্রমথর খবর।"

অমিয়া কহিল, "পুরুষ মানুষ তুঃখে পড়লে তবে খবর দেয়, নিশ্চয় আনন্দে আছেন তিনি।"

তাহার কণ্ঠস্বরে কারুণ্যের আভাস ফুটিল। ললিতা আর প্রশ্ন করিল না। মোটর ছুটিতে লাগিল।

দেওঘর শহর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকে তাহারা চলিল। উঁচু নীচু সাঁওতাল পরগণার মাঠ। গত বর্ষায় কোথাও কোথাও পথ ভাঙিয়াছে, গাড়ী হেলিয়া তুলিয়া চলিল। অনেকদিন পরে বাহির হইয়া অমিয়ার মনটা আজ যেন একটু ছাড়া পাইয়াছে। পৃথিবীর মানুষরা তাহাকে যন্ত্রণাই দিল, তাহার মুখের দিকে কেহ চাহিল না। এই তুঃখের পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া আর কোথাও চলিয়া

যাইতে পারিলে সে স্বস্তি পাইয়া বাঁচিত। অনেক ক্লান্তি, অনেক শ্রান্তি তাহার মনে জমা হইয়াছে, আর সে সহ্য করিতে পারে না।

সমস্ত সকাল তাহারা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল। সৌরজগতের কক্ষপথ হইতে এক একটা উল্কা যেমন ছিটকাইয়া যেখানে সেখানে গিয়া পড়ে, ঠিক তেমনি করিয়া অমিয়া তাহার প্রাত্যহিক জীবন-কক্ষপথ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আজ তাহার কোনো দুর্গমে, কোনো বিপদের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতে ভালো লাগিতে ছিল। প্রচলিত সংস্কারের যে সকল বন্ধনগ্রন্থি তাহার মনের সহিত বিজড়িত, আজ মুক্তিপথের মধ্যে সেগুলি যেন শিথিল হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের অর্থ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ত্রিকূট পাহাড়ের গুহায় গুহায় অরণ্যে অরণ্যে কেমন একটি আলোছায়াময় মোহ সঞ্চারিত আছে, অমিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাই উপভোগ করিতে লাগিল। লতাবিতানে, গাছের শিকড়ে ও জটায়, কীটপতঙ্গের রহস্যময় সুড়ঙ্গে, সন্ন্যাসীর গুহায়, প্রস্তরস্তূপের জটিল জটলায় কী যেন সে সমস্ত মনপ্রাণ ভরিয়া খুঁজিতে লাগিল, তাহার অপলক দৃষ্টির উৎকণ্ঠিত উদ্বেগ ও ঔৎসুক্য যেন এই পর্ব্বতের প্রস্তরের স্তরে স্তরে বিশ্বের সর্ব্বশেষ অর্থটি সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল।

মনে হইল এই অরণ্যে পর্ব্বতে গুহায় গহ্বরে লতায় পাতায় তাহার মনের সকরুণ বেদনাটি পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।

ত্রিকূটের স্নিগ্ধ আবহাওয়ামণ্ডল ত্যাগ করিয়া যখন তাহারা বালানন্দ আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিল তখন রৌদ্রের তাপ বাড়িয়াছে। সিঁড়ি বাহিয়া তাহারা আশ্রমের উপরে গিয়া উঠিল, পাশের পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইল, উপর হইতে পরিদৃশ্যমান দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের পিঙ্গল ধূসর শূন্যতা দেখিল—কোথাও জল, জলাশয়, লোকবসতি কিছুই চোখে পড়িল না,—যেন বিরহের রিক্ততা লইয়া কুমারী বসুন্ধরা চোখ বুজিয়া তপস্যায় বসিয়া আছে। অমিয়ার ইচ্ছা হইল ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া এই তন্দ্রাজড়িত মধুর হাওয়ায় আপন হৃদয়কে অজানা স্বপ্নলোকের পথে উধাও করিয়া ছাড়িয়া এই মনোরম তপোবনে বসিয়া থাকে, কিন্তু এমন সময় ললিতা সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, কহিল, "চলো অমিয়া, এবার বাসায় ফিরে যাই।"

নিশ্বাস ফেলিয়া অমিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাষ্পাকুলচক্ষে কেবল কহিল, "চলো।"

—এগার—

বাসায় আসিয়া তাহারা যখন পৌঁছিল, মধ্যাহ্ন রৌদ্রে রিখিয়ার মাঠ তখন হাহা করিয়া জ্বলিতেছে। বেলা বারোটা বাজে।

ভিতরে ঢুকিয়া অমিয়ার কেমন একটা সন্দেহ হইল। ঝি, চাকর, স্নানাহারের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না—সমস্ত বাড়ীটার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আছে। বৌদিদি—বলিয়া অমিয়া একবার ডাকিল, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। সে তাড়াতাড়ি মায়ের ঘরের দিকে গেল।

ভিতরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহাতে আর তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না। তাহার মায়ের পাশে দুইজন ডাক্তার, নরেশ, অমলা, প্রতিবেশী জন চারেক স্ত্রীপুরুষ—সকলেই স্তব্ধভাবে বসিয়া, কাহারও মুখে কথা নাই। অমিয়া কাছে সরিয়া আসিল, অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে কম্পিতপদে দাঁড়াইল।

নরেশ কোনো কথা কহিল না, কেবল পকেট হইতে একখানা রেজেষ্টারী চিঠি বাহির করিয়া অমিয়ার দিকে ফেলিয়া দিল। চিঠিটা অমিয়া কুড়াইয়া লইবে এমন সময় শৈলবালা অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং দেখিতে দেখিতে

তাঁহার শিয়রের কাছে পাত্রটিতে মাথা তুলিয়া গল্ গল্ করিয়া রক্ত বমন করিলেন। অমিয়া শিহরিয়া উঠিল।

স্ত্রীর দিকে চাহিয়া নরেশ কহিল, "এখানে থাকার দরকার নেই, আমরা আছি, অমিয়াকে নিয়ে তোমরা ওঘরে যাও।"

হাঁসপাতাল হইতে একজন নার্সকে আনা হইয়াছিল, সে শৈলবালাকে সুস্থ করিয়া বাতাস করিতে লাগিল। শৈলবালা নির্জীব হইয়া পড়িলেন। অমলা উঠিয়া অমিয়াকে লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

চিঠিখানা মন্মথ লিখিয়াছে নরেশের নিকট। ভিতরে শৈলবালার নিকট লিখিয়াছেন রমাসুন্দরী কয়েক লাইন মাত্র। পত্রপাঠমাত্র তিনি শৈলবালাকে চলিয়া আসিতে লিখিয়াছেন। মন্মথ সকল কথাই জানাইয়াছে। প্রমথর আহত হইয়া হাঁসপাতালে যাওয়ার কথা, বনমালীর শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ, ডাকাতি ও হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত শান্তিদয়ালের গ্রেপ্তার ও আবদ্ধ থাকার কথা, পুলিশ কর্তৃক সোনাপুরার বাড়ীর অবোরোধের কথা—সমস্ত সংবাদ জানাইতে মন্মথ কিছুই বাকি রাখে নাই। চিঠির মর্ম্মের কথা গোপন রাখা বিধেয় নয় মনে করিয়া নরেশ তাহার মাসিমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিল। শৈলবালা প্রথমে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে জ্ঞান হইয়া রক্ত বমন করিতে সুরু করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, এখানকার বাসা উঠাইয়া আজই সকলে মালদহ

অভিমুখে যাত্রা করিবেন। অপরাহ্নের গাড়ীতে কলকাতার পথে সকলে রওনা হইবেন।

কিছুক্ষণ পরে অমলা আসিয়া অশ্রুনয়নে নরেশকে ডাকিয়া লইয়া গেল। নরেশ গিয়া দেখিল অমিয়া অজ্ঞান হইয়া আছে। তাহার ফিট হইয়াছে,—আঘাত সহ্য করিতে পারে নাই। নরেশ শশব্যস্তে স্ত্রীর পাশে বসিয়া একটা স্মেলিং সল্টের শিশি লইয়া শুশ্রূষায় লাগিয়া গেল।

অমিয়ার যখন জ্ঞান হইল, বেলা তখন তুইটা বাজে। উপবাসক্লিষ্ট ক্লান্ত শরীরে সে উঠিয়া বসিল। অর্দ্ধ জ্ঞান অবস্থায় কেবল বলিতে লাগিল, "প্রমথদা তুমি আমার কথা কৈ রাখলে, বাবাকে মারলে আমায়ও মারলে—আমি তোমায় কি ভুল বুঝেছি?" অনেক সময় পরে অমিয়ার পূর্ণ জ্ঞান হইল—সে তখন মুখ বুজিয়া বসিয়া রহিল কিন্তু বসিয়া থাকিলে তাহার চলিবে না, কাঁদিবারও সময় কম, ঘণ্টা তিনেক মাত্র সময় বাকি। তাহাকে সমস্ত গুছাইয়া লইতে হইবে। এইরূপ রোগী লইয়া তাহাদের যাইতে হইবে, পথের সাথী নরেশ ভিন্ন আর কেহ নাই। সুতরাং নরেশের সঙ্গে অমলাও যাইবে। ওদিকে রোগী পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল, এদিকে সকলে বাঁধা-ছাঁদায় মন দিল।

প্রতিবেশীরা অনেক সাহায্য করিলেন। জিনিস পত্র লইয়া একখানা গরুর গাড়ী আগেই যাত্রা করিল, এবং বেলা

চারিটার পর শৈলবালাকে সঙ্গে লইয়া একখানা মোটরে অমিয়া ও অন্য মোটরে নরেশ অমলাকে লইয়া স্টেশনের দিকে যাত্রা করিল। ঝি, চাকর ও বামুন স্থানীয় লোক, তাহারা বকশিস্ ও মাহিনা লইয়া চলিয়া গেল। ললিতা তাড়াতাড়ি আসিয়া সাশ্রুনেত্রে কি যেন অমিয়ার কানে কানে বলিয়া গেল, অমিয়া কিছু শুনিল, কিছু শুনিতে পাইল না। সমস্ত প্রতিবেশীর করুণ সমবেদনা ও স্নেহ বহন করিয়া মোটর ছুটিয়া চলিল। কাল বৈশাখীর কালো মেঘে তখন আকাশ ঘনাইয়া আসিয়াছে।

প্রান্তরের উপর দিয়া মোটর তীরবেগে চলিল, আমিয়া সেইদিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়াছিল। কি যেন ছায়াছবির ন্যায় তাহার চোখের সুমুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহার অর্থ নাই, সঙ্গতি নাই, ব্যখ্যা নাই—তাহা বিশ্বাস করিতেও যেন তাহার অন্তরাত্মা প্রতিবাদ করিয়া উঠে। সে কাঁদিবে না, ভাবিবেনা, প্রশ্ন করিবে না, কাহারও প্রতি অভিমান জানাইবে-না। তাহার পিতা করারুদ্ধ, তাহার প্রমথদা রক্তাক্ত অবস্থায় হাঁসপাতালে, তাহার বনমালী দাদাকে হত্যা করা হইয়াছে। ইহা যেন একটা গোয়েন্দা উপন্যাসের সর্ব্বাপেক্ষা আজগুবী পরিচ্ছেদ। ইহাকে বিশ্বাস করা যায় না, আবার অবিশ্বাস করিলেও ঘটনার সঙ্গতি রাখা যায় না। এ যেমনই অদ্ভুত, তেমনই অবিশ্বাস্য। অমিয়া কাঠের

পুতুলের ন্যায় বসিয়া রহিল। তাহার মাও মৃতবৎ হেলিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিলেন, আর তাঁহার তুটি রুগ্ন চোখের কোণ বহিয়া উত্তপ্ত অশ্রু অনর্গল তুই গাল বাহিয়া অবিশ্রান্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল। মোটর আসিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিল।

—বারো—

সন্ধ্যার আলো জ্বলিতে আর বিলম্ব নাই। আশ-পাশের পল্লী হইতে সন্ধ্যারতির শাঁখ বাজিয়া উঠিয়াছে।

ঘরে বসিয়া কাগজ পত্র লইয়া প্রমথ লেখাপড়ার কাজকর্ম্ম করিতেছিল। চাকর একটা আলো রাখিয়া গেছে। বাহির হইতে মন্মথ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। কহিল, "দাদা, আমার নামে এই একটা টেলিগ্রাম এলো, পড়ো।"

টেলিগ্রাম হাতে লইয়া প্রমথ পড়িল। দেওঘর হইতে নরেশ জানাইয়াছে,—একুশে তারিখে সকালে মালদহ পৌঁছিতেছি, দয়া করিয়া স্টেশনে দেখা করিয়ো। সবাই যাইতেছি।

গোলাপী রংয়ের কাগজ খানা লইয়া প্রমথ অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিল, পরে কহিল, "আজ কত তারিখ ?. ওঃ, বিশে। তবে ত কাল ভোরেই ওরা আসবে। তুই থাকবি নাকিরে ষ্টেশনে ?"

মন্মথ কহিল, "আমার উপস্থিত থাকারই ইচ্ছে, দাদা। অমিদিরা আসছে, তাছাড়া ওদের এত বিপদ—"

প্রমথর মাথার ও হাতের ক্ষতস্থানে এখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আজকাল সে একটু আধটু চলিতে ফিরিতে পারে। টেলিগ্রাম

খানা হাতে লইয়া সে ভিতরে গিয়া মা ও মাসিমাকে ডাকিল। তাঁহারা আসিয়া তারের মর্ম্ম শুনিলেন।

প্রমথ কহিল, "এখন আমাদের কি করা উচিত মা ?"

রমাসুন্দরী স্মৃতিদেবীর দিকে চাহিলেন স্মৃতিদেবী দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "ম্যানেজারের সঙ্গে চাকর যাবে ষ্টেশনে, কি বলো দিদি ?"

শত্রুতা যতই বড়ই হোক, কর্ত্তব্যের কথা প্রমথ ভুলিতে পারিল না, কহিল, "তোমাদের একজনের কি যাওয়া উচিত নয় মা ?"

রমাসুন্দরী কহিলেন, "তোরও যাওয়া উচিত, বাবা প্রমথ ?"

স্মৃতি দেবী কহিলেন, "আমার মত নেই দিদি, আমার ছেলের প্রাণহন্তা যে-লোক, তার পরিবারের প্রতি একটু দরদ আমার নেই। ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে ছেলে ফিরে পেয়েছি—একথা কোনোদিন ভুলতে পারব না ভাই।"

যে-বনেদী বংশের বধূ হইয়া রমাসুন্দরী এতদিন তাঁহার উচ্চশিক্ষা ও শালীনতাকে অম্লান রাখিয়াছিলেন তাহাই এবার তিনি প্রকাশ করিলেন,

"বলিলেন, ভাই শত্রুপক্ষ আজ বিপন্ন হয়ে সাহায্য ভিক্ষা যদি চায় তবে তাকে দিতেই হবে। ছোট বউ আর তার মেয়ে কোনো অপরাধ করেনি, অনেক দুর্দ্দিনে তারা

আমাদের ছাতা দিয়ে মাথা রেখেছিল—তারা নিরপরাধ। তাছাড়া তাদের দেখবার এখন কেউ নেই। আমি যদি আজ তাদের আশ্রয় দিতে না পারি তবে মিথ্যেই মুখুজ্যে বংশের বউ হয়ে এসেছিলুম। তার উপর অমি যে আমার—”

স্মৃতিদেবী ব্যথিত চিত্তে কিছু বলিতে গেলেন, কিন্তু রমাদেবী বলিলেন “ভাই, দুঃখ করোনা তোমার ছেলে তোমারই থাকবে, তুমিই প্রমথ, মন্মথর মা, কিন্তু ওদের কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দিয়ো না। বিপদের চেহারা জানি বলেই বিপন্নকে সাহায্য দেবার জন্যে মন ছুটছে। কাল সকালে আমরা সবাই যাবো ষ্টেশনে। ছোটবউ যে আমার ছোটবোন, অমি যে আমার মেয়ে। তুমি মত দাও স্মৃতি, ওরা যেন কাল আমার সঙ্গে ষ্টেশনে যেতে পারে।”

—এই বলিয়া রমাসুন্দরী রান্নার দিকে চলিয়া গেলেন।

সেই রাত্রে মন্মথ শুইতে গেল কিন্তু প্রমথর দুই চোখে নিদ্রা নামিল না। বারান্দার দক্ষিণ দিক হইতে শেষ চৈত্রের মধুর বাতাস আসিতেছিল। সেটা কৃষ্ণপক্ষ, আকাশে জ্যোৎস্না নাই। অনেকদিন পরে জাগিয়া জাগিয়া সে আজ অমিয়ার কথা চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার পিতা কারাগারে, মায়ের জীবনেরও বিশেষ আশা ভরসা নাই। আমিই তার মূল কারণ, অমিয়ার নিকট কি করিয়া মুখ দেখাইবে।

আজ কেবল তাহাদেরই মানুষ্যত্বের দরবারে আবেদন আসিয়াছে, উহাদের পাশে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে, উহাদের দায়িত্ব বহন না করিলে মানবতার বিচারালয়ে অপরাধী হইয়া থাকিতে হইবে। একদিন ছিল যখন সে অমিয়াকে ভালো-বাসিত, কিন্তু আজ আর সেদিন নাই, আজ সে কথা কল্পনা করাও অস্বাভাবিক। কিন্তু সেদিনকার ভালোবাসা যদি তাহার এতটুকুও সত্য হইয়া থাকে তবে অমিয়ার বিবাহের জন্য সে চেষ্টা করিবে। যে-পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ স্থির ছিল, শান্তিদয়ালের গ্রেপ্তারের পর তাহারা জবাব দিয়াছে। আজ অমিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার মানুষ নাই, তাহার পাশে দাঁড়াইবার লোকও বিরল; দীর্ঘরাত্রি বিনিদ্র চক্ষে জাগিয়া প্রমথ তাহার নিজের কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল।

সকাল সাতটায় ট্রেণ আসিবে। প্রমথ ও মন্মথকে লইয়া রমাসুন্দরী ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। স্মৃতিদেবী আসেন নাই তিনি দুই তিনজন চাকর সঙ্গে দিয়াছেন—পাছে প্রমথদের কোনো অসুবিধা কিছু ঘটে। ষ্টেশনের বাহিরে মোটর প্রস্তুত আছে।

দেখিতে দেখিতে ঠিক সাতটা বাজিতেই ট্রেণ আসিল। কি ভাবে তাহারা আসিয়া পৌঁছিতেছে তাহা কাহারও জানা ছিল না, প্রমথ কেবল দু'তিনটা কুলী ও তাহাদের চাকরদের প্রস্তুত রাখিয়াছিল। গাড়ী থামিতেই একখানা ইন্টার ক্লাশ

কামরায় নরেশকে মুখ বাড়াইতে দেখা গেল। তাহারা সকলে গাড়ীর দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

ভিতরের দৃশ্য দেখিয়া রমাসুন্দরী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বড় একখানা বেঞ্চের উপর শৈলবালা অর্দ্ধমৃতবৎ পড়িয়া আছেন আর তাহারই পাশে বসিয়া অমিয়া পাখার বাতাস দিতেছে। অমিয়ার শীর্ণ চেহারা দেখিয়া আর তাহাকে চিনিবার উপায় নাই। তাঁহাদের দেখিয়া নরেশ ও অমলা গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল। মন্মথ কুলী লইয়া হেপাজত করিয়া জিনিসপত্র সমস্ত নামাইয়া লইল।

শৈলবালার নামিবার ক্ষমতা নাই, প্রমথ গিয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে বলিয়া একটা ষ্ট্রেচার বন্দোবস্ত করিয়া আনিল। তাহার শরীর এখনও খুবই দুর্ব্বল, এইটুকু পরিশ্রমেই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কাহারও মুখে কোনো কথা রহিল না— কেবল ষ্ট্রেচারে করিয়া অতি সাবধানে শৈলবালাকে নামাইয়া আনা হইল। মন্মথ এই দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

নরেশ রমাসুন্দরীর পায়ের ধূলা লইয়া কহিল, "মাসিমার আর বাঁচবার আশা নেই, বড় মাসিমা। অমিরও ভাবনায় কি চেহারা হয়েছে, দেখুন।"

রমাসুন্দরী অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "আশা ছাড়তেও পারবো না বাবা, ওর ঘর সংসার সব যে প'ড়ে রয়েছে।"

অমিয়া আসিয়া জেঠিমার পায়ের ধূলা লইল, রমাসুন্দরী

তাহাকে বক্ষে লইয়া কহিলেন, "ভয় কি মা, আমি ত এখনো রয়েছি। যতদিনেই হোক ঠাকুরপোও ত আবার ফিরবেন। চলো, বাড়ী চলো।"

মাথায় ফেট্টি বাঁধা, হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্রমথকে অমিয়া সহসা চিনিতে পারে নাই। কিন্তু আজ চিনিবার প্রয়োজনও তেমন ছিল না। যেদিন সে মামলা করিতে মানা করিয়াছিল, পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছিল সেদিন প্রমথ শোনে নাই, উচ্চাভিলাষী যুবক সেদিন ভ্রান্ত আদর্শের অনুসরণ করিয়া অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গিয়াছিল। তাহার সেই যুদ্ধ ঘোষণা তাহার সেই বিদ্বেষ কেবল সংসারে আগুন জ্বালাইল না, কেবল তাহাকেই ক্ষতবিক্ষত করিল না, কয়েকটি নিরপরাধ প্রাণীকে হিংসা ও বিবাদের আগুনে পোড়াইয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিল! অমিয়া একবার মনে করিল কাছে গিয়া সে প্রমথর পায়ের ধূলা লয়, কিন্তু লইবে কেমন করিয়া? যাহাকে আঘাত করিলে আঘাত ফিরাইয়া দেয়, প্রতারণা করিলে প্রতিবাদ জানায়, ব্যথা দিলে যে দুঃখ দেয়—যাহার ভিতরে সন্দেহ, ভয়, দ্বিধা, ঈর্ষা সমানই প্রবল,—তাহাকে ভালোবাসিলেও সে সাধারণ মানুষ, তাহার ভিতর অসাধারণত্ব কিছু নাই। অমিয়া তাঁহাকে দেবতা মনে করিয়াছিল, মনে করিয়াছিল একটা অতিমানব—কিন্তু তাহার সেই ভুল নির্ম্মম ভাবে চূর্ণ হইয়া গেছে।

একখানা মোটরে শৈলবালা ও অমিয়াকে লইয়া রমা-সুন্দরী উঠিলেন। দ্বিতীয় মোটরে নরেশ আর অমলা। তৃতীয় খানায় জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া প্রমথ ও মন্মথ উঠিয়া বসিল। বাহির হইতে তুইটা পরিবারে সংঘর্ষ লাগিয়াছে কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাহাদের চিরকালের সখ্য এতবড় তুর্দ্দিন ও শত্রুতার মধ্যে আজিও ভাঙিয়া পড়ে নাই। প্রতারণার খেলায় শান্তিদয়াল মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, ন্যায়-যুদ্ধের খেলায় বালক প্রমথও অন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—ইহার মধ্যে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন ছিল গৌণ,—কিন্তু আজ ঈশ্বরের কাছে উভয়কেই দায়ি করা চলিবে এই কারণে যে, তুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের কৃত যে কুরুক্ষেত্র তাহাতে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই যুদ্ধের সকলের বড় শোচনীয় পরিণাম হইল, নিরপরাধ নির্লিপ্ত সাধারণকে আত্মবলি দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। গাড়ীর ভিতরে বসিয়া রমাসুন্দরী এই কথাই ভাবিতেছিলেন এবং তাঁহারই কোলে মাথা রাখিয়া শত্রু পক্ষীয়া মুমূর্ষু শৈলবালার চোখ দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু ঝরিতেছিল।

মালদহে গাড়ীগুলি আর কোথাও থামিল না। শৈলবালার জন্য ঔষধপত্র চিকিৎসা ব্যবস্থা সমস্তই নরেশের নিকট ছিল, নূতন করিয়া আর ডাক্তারের প্রয়োজন হইবে না।

এখন ঈশ্বরের হাতে সব। সকলের পিছনে পিছনে প্রমথর মোটর চলিতে লাগিল।

সেই চিরপরিচিত গ্রামের পথ ধরিয়া মোটরগুলি সোনাপুরার দিকে আসিল। তাহাদের আবাল্য সমস্ত স্মৃতি এই পথের বাঁকে বাঁকে জড়াইয়া আছে। চারিদিকের যাহা কিছু দৃশ্য সবই স্বপ্নের মতো বোধ হইতেছে। তাহাদের জীবন, তাহাদের হৃদয় ও মন যেন আজ বহুদূরে সরিয়া গেছে, হয়ত সেই জীবন আর তাহাদের ফিরিয়া আসিবে না। গাড়ীগুলি আসিয়া তাহাদের বাড়ীর কাছে দাঁড়াইল।

শান্তিদয়ালের বাড়ী সরকারি শীলমোহর করিয়া বন্ধ, সেখানে পাহারাদার আছে। সে বাড়ীতে ঢুকিতে হইলে দরখাস্ত করিয়া পুলিশের অনুমতি লইতে হইবে। সুতরাং প্রমথরা তাহাদের নিজের বাড়ীতে সকলকে আনিয়া ফেলিল। চাবি প্রমথর সঙ্গে ছিল, সে-গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর দরজা খুলিল। তারপর শৈলবালাকে ধরাধরি করিয়া রমাসুন্দরী, অমলা ও অমিয়া নামাইয়া ঘরে লইয়া শোয়াইয়া দিল। শৈলবালা একবার চোখ চাহিয়া রমাসুন্দরীকে দেখিলেন, কি যেন বলিলেন, তাহার পর দেখিতে দেখিতে তাঁহার রুগ্ন চক্ষের কোন বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া আসিল। সকলেই মুখ চাওয়া চায়ি করিল এবং নিঃশব্দে ইহাই প্রকাশ করিল যে, তাঁহার বাঁচিবার আশা আর

নাই। গ্রামের লোকজন আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

সেদিন হাটের বার ছিল বলিয়া জিনিসপত্র পাওয়া গেল। অমলা রান্না করিতে গেল, রোগীর অবস্থা দেখিয়া সকলেই আহারাদি চুকাইয়া লইবার প্রয়োজন অনুভব করিল।

রমাসুন্দরী একবার বাহিরে আসিয়া প্রমথকে বলিলেন, "বাঁচবার আশা ত' ছোটবউয়ের নেই, তুই একবার ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারবি বাবা?"

প্রথম গিয়া নরেশের সহিত পরামর্শ করিল। দেখা করানো কিছুতেই সম্ভব নয়—অনুমতি যদি বা পাওয়া যায় তাহাতে সময় লাগিবে—তবু তাহারা চেষ্টা করিবে। দুইজনে আলোচনা করিয়া নরেশ তখনই গাড়ী লইয়া পুনরায় মালদহের দিকে চলিয়া গেল। ওদিকে ফলমূল দুধ ইত্যাদি আনাইয়া রমাসুন্দরী শৈলবালাকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিলেন। শৈলবালা রমাসুন্দরীর সহিত কি যেন ধীরে ধীরে দুইচার কথা বলিতে লাগিলেন।

বাড়ীতে বিপদের একটা ছায়া নামিয়াছে, সকলেই সভয়ে কাজকর্ম্ম সারিতে লাগিল। অমলা ও অমিয়া পুকুরঘাট হইতে স্নান সারিয়া আসিয়া সকলের আহারাদির ল্যাঠা চুকাইয়া লইল।

বেলা অপরাহ্ণের দিকে শৈলবালার শ্বাসকষ্ট দেখা দিল। সকলেই সেই শোকাবহ উৎকণ্ঠার ভিতর তাঁহাকে লইয়া

উদ্বিগ্নভাবে বসিয়াছিল এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে নরেশ আসিয়া হাজির। সে আসিয়া জানাইল যে, শৈলবালার অবস্থা না দেখিয়া দারোগা কিছুতেই অনুমতি দিবে না। শান্তিদয়ালের অপরাধ অতি গুরুতর, তাঁহার সহিত কাহারও সাক্ষাৎ করাইতে হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ হুকুম লইতে হইবে, কিন্তু সাহেব গিয়াছেন শিকারে, পরশ্ব ফিরিবেন। স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া শান্তিদয়ালকে সাক্ষাৎ করানো যাইতে পারে,—কিন্তু দারোগা তাহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার আগে রোগীকে দেখিতে চাহেন।

শৈলবালা ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "আমি যাবো দিদি দেখা করতে।"

পথে এই রোগীর মৃত্যু হয় হোক তবু হিন্দু রমণী হইয়া মরিবারকালে স্বামীকে একবার দেখিতে পাইবে না ইহা সঙ্গত নহে। রমাসুন্দরী যাইবার অনুমতি দিয়া কহিলেন, "নরেশ, তুমিই একে নিয়ে যাও বাবা, অমলা আর অমিয়া সঙ্গে যাক্।"

একখানা মোটর মোতায়েন ছিল। রোগীকে ধরাধরি করিয়া সেই মোটরে তুলিয়া দেওয়া হইল। গাড়ী ছুটিল।

রৌদ্র তখনও ছিল। যাইবার পথে বিশেষ অসুবিধা নাই, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে আলো পাওয়া যাইবে না, সেটা কৃষ্ণপক্ষ—সুতরাং যেমন করিয়াই হোক তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইবে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গাড়ী আসিয়া যখন মালদহে পৌঁছিল, দেখা গেল শৈলবালার অবস্থা কিছু সতেজ হইয়াছে। নরেশ উৎসাহিত হইয়া সোজা গাড়ী ঘুরাইয়া থানার ফটকের কাছে লইয়া আসিল।

আসামী হইলেও মালদহ ও আশপাশের গ্রামে শান্তিদয়ালের খ্যাতি কম ছিল না। বিশেষ করিয়া মুখুজ্যেদের জমিদারীর নায়েব হিসাবে তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। তাঁহার মুমূর্ষু স্ত্রী দেখা করিতে আসিয়াছে ইহাতেই একটা সোরগোল উঠিল।

দারোগা নিতান্ত অবিবেচক নহেন, তিনি অবস্থা দেখিয়া সত্য সত্যই কিছু অভিভূত হইলেন এবং একটা ষ্ট্রেচার আনাইয়া দুইটা লোকদ্বারা শৈলবালাকে নামাইয়া ভিতরে লইলেন। নরেশ অমলা ও অমিয়া সঙ্গে সঙ্গেই রহিল। দারোগা খাতাপত্রে কি যেন লিখিয়া লইতে লাগিলেন।

শান্তিদয়ালকে হাজতে রাখা হইয়াছিল। মনে হয় তাঁহার উপর দিয়া একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব চলিয়া গেছে। অন্ধকার কারাকক্ষের নির্জ্জনে থাকিয়া তাঁহার যে আকৃতি হইয়াছে তাহা দেখিলে ভয় করে। তাঁহাকে দেখিয়া অমিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সরিয়া আসিল।

ষ্ট্রেচারে করিয়া দুইটা লোক শৈলবালাকে লইয়া

শান্তিদয়ালের কাছে দিয়া সরিয়া আসিল। দারোগা, নরেশ, অমলা—সকলেই লোহার গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভিতরে নিঃশব্দ, নীরব—স্বামীস্ত্রী কাহারও কথা শুনা যাইতেছিল না। মনে হইল মুখের একটা শব্দ করিয়া শান্তিদয়াল কাঁদিতেছেন। বাহিরে সকলে নতমস্তকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে আসামীর কণ্ঠস্বর সামান্য শোনা গেল। শান্তিদয়াল বলিলেন, "শান্তি······ঈশ্বরের শান্তি······সান্ত্বনার ভাষা নেই! কি বল্‌ছ? আশীর্ব্বাদ?······না, না ছোট-বউ···বেশ, তাই হোক, প্রমথকে আমি চিনতুম, সে খুবই ভালো, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান······না, তোমার অন্তিম ইচ্ছেই পূর্ণ হোক। আমার শেষ সম্ভাষণ নিয়ে যাও তুমি, অমিয়াকেও আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ো। আমি অপরাধী হলেও আমি পিতা, শত অপরাধেও বাৎসল্য ক্ষুণ্ণ হয় না।—হ্যাঁ, জানি, আমার কলঙ্ক কাহিনী শুনে রায়কাঠির পাত্র ভেগে গেছে।"

আর কি কথা হইল শুনা গেল না। প্রায় আধঘণ্টা পরে আবার লোক দুইটা ভিতরে গিয়া ষ্ট্রেচার ধরিয়া শৈলবালাকে তুলিয়া আনিয়া গাড়ীর মধ্যে শোয়াইয়া দিল। এমন সময় ভিতর হইতে সহসা ভীষণ চীৎকার শোনা গেল—"দারোগা, সাহেব, ছোটবউ······

দারোগা কহিলেন, "আপনারা আর দাঁড়াবেন না, শীঘ্র চলে যান্—

শান্তিদয়ালের বিদীর্ণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া নরেশ ও অমিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। দারোগা কাছে আসিয়া রোগী না শুনিতে পায় এইভাবে চুপি চুপি কহিলেন, আজ কদিন থেকে শান্তিবাবুর একটু মাথার দোষ দেখা দিয়েছে,—মামলা তাই মুলতুবী আছে। আচ্ছা, নমস্কার—এই বলিয়া তিনি আবার ভিতরে চলিয়া আসিলেন।

মোটর আবার মালদহ হইতে সোনাপুরার দিকে ছুটিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন আসন্ন হইতেছে। পশ্চিম আকাশে দিগান্তকালের সূর্য্যের অন্তিম শয়নের চিতা জ্বলিতেছে। পুনরায় শৈলবালার নির্জীব অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সকলেই আবার ভীত হইয়া উঠিল।

গ্রামের পথ ধরিয়া মোটর উৎকণ্ঠ বেগে ছুটিতে লাগিল। আর কিছু না হোক, মৃত্যুকালে শৈলবালা স্বামীকে একটিবার দেখিতে পাইলেন ইহাতেই যেন সকলে এই করুণ শোচনীয় অবস্থাতেও কিছু সান্ত্বনা পাইতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই, অন্ধকার ঘন হইবার আগে, সকলে পুনরায় সোনাপুরার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। সকলে তাহাদের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

তের

অমিয়া ও তার মাকে মালদহ ষ্টেশনে আনিবার জন্য রমাসুন্দরী পুত্র দুইটিকে লইয়া যাইবার পর হইতে দুই দিন চলিয়া গিয়াছে। প্রমথ এখনও স্মৃতিদেবীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসে নাই। অমিয়ার মাকে লইয়া হাজতে শান্তিদয়ালের সহিত সাক্ষাতের কথা স্মৃতিদেবী সব শুনিয়াছেন। তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নয় যে প্রমথরা শত্রু পক্ষের সহিত এতটা মেলামেশা করে।

সেই কথাই স্মৃতিদেবী আনমনে আলোচনা করিতেছেন, রমাসুন্দরী তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ষ্টেশনে যাওয়াটা স্মৃতিদেবীর আদৌ ভাল লাগে নাই। তাঁর মনের কোণে একবার এই সন্দেহ উঁকি মারে "পর কখনও কি আপন হয়?" কিন্তু প্রমথ বা তার মার ব্যবহার এমনি আপনজনের মত এমনি সরল স্নেহময় যে এইরূপ সন্দেহের কোন চিহ্নই দেখা যায় না।

স্মৃতিদেবী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, "অমিয়া ও অমিয়ার মার প্রতি এদের এত টান কেন? ইহা কি কেবল কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য না প্রাচীন মুখুজ্যে বংশের ঔদার্য্য গুণ। প্রমথর মার একদিনের কথা তার মনে একটু চিন্তার তরঙ্গ তুলিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন "দিদির কি ইচ্ছা

যে পরম শত্রুর কন্যা অমিয়ার সহিত প্রমথর বিবাহ দেয়? না তা কিছুতেই হইতে পারবে না। আমি তা হইতে দেব না। হইলেইবা অমিয়া সুন্দরী, আমি প্রমথর জন্য উহা অপেক্ষা ভাল পাত্রীই যোগাড় করিতে পারিব। প্রমথর কি অমিয়ার প্রতি কোন আসক্তি আছে? না সেরূপ লক্ষণ ত আমি আদৌ দেখি নাই।”

নানা রকম চিন্তা স্মৃতিদেবীকে অভিভূত করিল, তিনি তখন অন্যদিকে মন দিবার ইচ্ছায় সন্ধ্যা আরতির ব্যবস্থায় চলিয়া গেলেন।

প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় শ্বেতপাথরের পঞ্চরত্ন দেব দেউল চাঁদের কিরণে হাসিয়া উঠিয়াছে, দেবালয়ের অন্দর হইতে ধুপ ধুনার গন্ধ, পুষ্পের সৌরভ সকলকে মাতাইয়া তুলিতেছে। দেবতার গলায় মণিহার দীপছটায় দর্শকবৃন্দের চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে। অদূরে নহবতের সুমধুর তান ভাসিয়া আসিতেছে। ছেলেমেয়ের দল আরতি দেখিবার জন্য ভীড় করিয়া রহিয়াছে। এমন সময় শুভ্রবস্ত্র পরিহিতা শ্বেতপুষ্পমাল্যে শোভিতা, ভালে শ্বেতচন্দনমণ্ডিতা এক সৌম্য রমণী মূর্ত্তি অর্ঘ্যপাত্র লইয়া ধীর পদক্ষেপে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন দর্শকবৃন্দ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল।

স্মৃতিদেবী দেবতার সম্মুখে অর্ঘ্যপাত্র স্থাপিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মণ্ডপের পাশেই একটী যুবতী

চম্পক পুষ্পরাশি লইয়া চম্পককলিসদৃশ অঙ্গুলি দ্বারা ধীরে ধীরে নিবিষ্টচিতে মালা গাঁথিতেছে।

স্মৃতিদেবী ডাকিলেন—"মলিনা, তুমি কখন এলে? আমায় ত ডাকনি, অর্ঘ্যপাত্র ত ল'য়ে আসনি।"

"বড় মা! মন্দিরে আসবার সময় আমি দেখ্‌লাম আপনি কি ভাব্‌ছেন, চুপকরে বসে আছেন, আপনাকে বিরক্ত করতে তখন আমার ভরসা হল না, তাই এখানে এসে ঠাকুরের জন্য মালাটি গাঁথছি।"

"কি সুন্দর মালাটী! আরতির পর তুই এই মালাটী ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিস্।"

"না বড় মা, আপনি পরিয়ে দেবেন।"

"কেন রে মলিনা? তোকে কি একদিনও ঠাকুরের গলায় মালা দিতে নিই, ও! তুই বুঝি বরের গলায় ছাড়া আর কারও গলায় মালা দিবি না।"

মলিনা কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলিল, "না বড় মা, ঠাকুরের গলায় ছাড়া আর কারও গলায় আমি কখনও মালা দেব না।"

কথা কয়টি অতর্কিতে বলিয়া স্মৃতিদেবী যেমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, মলিনাও সরমে একেবারেই নতমুখী হইয়া রহিল। আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য ধ্বনির রোলে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল। সমস্ত দিনের কাজ কর্ম্মের ভিতরে সংসারের নর-নারীরা হয়ত ভগবানের চিন্তা ক্ষণেকের

তরেও করিতে পারে না। কিন্তু যখন দেবালয়ের এই আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে তখন সকলের চিত্ত অপার্থিব চিন্তায় মন দেয়, দেবতার চরণে নিবেদন করিবার জন্য আকুল হয়। বাংলার ধনী ও জ্ঞানীরা পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে শত শত এমনি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া মানবেরা চিত্তবৃত্তিকে ভগবানের শ্রীচরণের দিকে লইয়া যাইত।

আরতি শেষ হইল। সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন স্মৃতিদেবীর ইঙ্গিতে মলিনা যুক্তকরে সমধুর স্বরে ভজন গাহিলেন :

“মম জীবন মরণের সাথী
নারি তোমা পাশরিতে দিবারাতি।
প্রাণ বিধুর তব দরশ বিহনে গো
প্রাণে তা আছি গাঁথি,
বাতায়নে বসি পথ চাহি গো
খোলো আঁখি অরুণ ভাতি।
মীরারি প্রভু পরম বিমোহন
চরণ লোভে হিয়া পাতি
অনুক্ষণ তব রূপ নেহারি
দরশ হরষে রহি মাতি।

ধীরে ধীরে দর্শকবৃন্দরা চলিয়া গেল, পুরোহিত মহাশয় ভোগ শীতলাদী সম্পন্ন করিয়া বিদায় লইলেন। মন্দিরে কেবল স্মৃতিদেবী ও মলিনা দুইজনেই অন্যমনে বসিয়া রহিলেন। দুই জনেই যেন দেবতার দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছে, স্মৃতিদেবীর কথায় মলিনা যে লজ্জা পাইয়াছিল তাহার সে জড়তা এখনও কাটে নাই। তাহার মুখের রাঙিনআভা এখনও যেন মিলায় নাই। স্মৃতিদেবীও কি এক গভীর মতলব সিদ্ধির ইচ্ছায় ভগবানের চরণে আত্ম নিবেদন করিতেছে, রাত্র অধিক হইতে লাগিল দুইজনে উঠিয়া ধীরে ধীরে গৃহের দিকে গমন করিল।

মলিনা পিতৃমাতৃহীনা, প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে যখন স্মৃতিদেবী তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন সেই সময় কাশীধামে মলিনার পিতা ও মাতার সহিত স্মৃতিদেবীর পরিচয় হয়। মলিনার পিতা প্রবাসে ভাল সরকারী চাকুরি করিতেন, সেই উপলক্ষে তিনি বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন এবং তাহার প্রতিপত্তি বহুতীর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্মৃতিদেবীর তীর্থভ্রমণে তিনি প্রধান একজন সঙ্গী হইলেন। প্রয়াগ, চিত্রকুট, মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, পুস্কর, সাবিত্রী, দ্বারকা, হরিদ্বার, কেদার, বদরিনাথ আদি বহু দুর্গম তীর্থে স্মৃতিদেবীকে মলিনার পিতা-মাতা ভ্রমণ করাইয়া আনিয়াছিলেন। অবশেষে যখন তাহারা অযোধ্যায় উপনীত হইলেন সেই সময়ে মলিনার পিতা ও মাতা একই রাত্রে বিসুচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া পরপর ইহধাম

ত্যাগ করেন। অন্তিম শয্যায় শায়িতা মলিনার মা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে যখন স্মৃতিদেবীর হস্তে অর্পণ করিলেন তখন তাহার বাকশক্তি ছিল না। তাহার সকরুণ দৃষ্টি স্মৃতিদেবীর মনে করুণার সঞ্চার করিয়াছিল। সেই মৃত্যু পথের যাত্রীর সকরুণ নিবেদনে স্মৃতিদেবী ভগবান সাক্ষ্য করিয়া মলিনার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মলিনার দিদিমা তখন জীবিত, মলিনার মামার বাড়ী ফৈজাবাদ। মলিনার পিতামাতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াই তাহার মামারা ও দিদিমা মলিনাকে লইয়া গেল, স্মৃতিদেবীর বাধা গ্রাহ্য করিলেন না কারণ স্মৃতিদেবী তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতা,সদ্য পিতৃমাতৃহীনা মলিনা স্মৃতিদেবীর স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। মলিনা তাহার দিদিমার কাছে স্মৃতিদেবীর হস্তে তার মা যে তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন সে কথাও বলিয়াছিল।

চোখের আড়ালে ও কানের ব্যবধানে মানুষ সবই ভুলিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে মলিনা ও স্মৃতিদেবী এসব ঘটনা ভুলিয়া গেল। মলিনার মামারা মলিনাকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্মৃতিদেবীও প্রথম প্রথম মলিনার লালন পালনের জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন। অসহায় মলিনা লেখাপড়ায় ডুবিয়া থাকিয়া তার পিতামাতার বিরহ ব্যথা ভুলিতে চেষ্টা করিত; ক্রমে ক্রমে ম্যাট্রিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া, ক্রফোর্ড কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ

হইল। নানারূপ অবস্থার বৈলক্ষণে মলিনার মামারা ক্রমশঃ দারিদ্রতার ও মৃত্যুর কবলে পতিত হইল; মলিনা এখন একবারেই অভিভাবক শূন্য ও নিঃসহায় অবস্থায় পড়িয়াছে। কএক মাস হইল মালদহে স্মৃতিদেবীর আশ্রয়ে আসিয়াছে। স্মৃতিদেবী মলিনাকে পাইয়া আনন্দিতই হইলেন, অবশ্য প্রমথ তাঁর অপত্যস্নেহের ভাণ্ডারই অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। মলিনা উচ্চ শিক্ষিতা কর্ম্মনিপুণা। সংসারের ঘাত প্রতিঘাত খাইয়া তাহার চিত্ত একেবারেই উদাসীন, ভোগ বিলাসে আদৌ তৃপ্তি নাই, জনসেবাই তাহার প্রধান কাম্য। বিলাতি দর্শন শাস্ত্রে অনার্স লইয়া মলিনা বি, এ, পাশ করিয়াছেন বটে, তাহা হইলেও তাহার চিত্ত ভারতের সাধনার ও সংস্কৃতির ধারার চর্চ্চায় উন্মুখ, তাই মলিনা স্মৃতিদেবীর অনাথালয় ও দেবালয় দেখিয়াই অত্যন্ত প্রফুল্ল। তাহার ব্যথিত হৃদয় দেবগ্রামে আসিয়া কিঞ্চিৎ শান্তি পাইয়াছে।

স্মৃতিদেবী তাহার সাংসারিক সুখ ও স্থিতির জন্য ব্যস্ত কিন্তু মলিনার মন সে বিষয় একেবারেই উদাসীন। দেবগ্রামের অনাথ আশ্রমের বালিকাদের শিক্ষা দান করিবার জন্য তাহার মন একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর স্মৃতিদেবী যখন বিশ্রাম করিতেছেন মলিনা ধীরে ধীরে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল, তাহারই পাশে বসিয়া মৃদু মন্দ করুণ কণ্ঠে বলিল, "বড় মা! একটা কথা বল্‌বো শুন্‌বেন্ তো?"

স্মৃতিদেবী—"বল্‌না, অত লজ্জা কিসের।"

মলিনা—"দেখুন বড় মা, অজ্ঞানই মানবের পরম শত্রু, এই অজ্ঞানই ও নিরক্ষরতাই আমাদের যত অনিষ্টের মূল, যত ব্যাভিচার, অত্যাচার, কুসংস্কার আমাদের ভিতর এসে আমাদের ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছে, আমাদের না আছে চরিত্র না আছে শৌর্য্য না আছে বীর্য্য আমরা হৃত সর্ব্বস্ব—"

"থাক্ থাক্ তোর আর অত বক্তৃতার দরকার নেই। সাধ করে লোকে বলে যে মেয়েরা দুপাতা লেখাপড়া শিখলেই বাচাল হয়। আমরা ত বাছা তোদের মত লেখাপড়া শিখিনি তবে কি আমরা কিছুই করতে পারি না। এখন কথাটা কি বল দেখি?"

"আমি বল্‌ছিলাম যে আপনি এতগুলি ছেলে-মেয়ের ভরণ পোষণ করেছেন, তাদের ত মানুষ করতে হবে, তাই বলি মেয়েদের শিক্ষা, আত্মনির্ভরতা ও জীবিকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থার জন্য একটা স্কুল খুল্‌লে হয় না। আপনি যদি সাহস দেন আমি এই কার্য্যে আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি।"

"হ্যারে? আমিও একথা অনেকবার ভেবেছি, এটা খুবই দরকার আমি জানি, তা বলে তুই কেন একটা সামান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য তোর অত জ্ঞান ও বিদ্যা আবদ্ধ করে রাখবি, তা আমি তোকে করতে দেব না। তোর মার

শেষ কথা আমার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে, আমি তোকে সুখী ও সংসারী করবই।”

মলিনা সে কথায় ততটা কান না দিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

———

চৌদ্দ

এদিকে শাস্তিদয়ালের সহিত হাজতে সাক্ষাৎ হইবার পর শৈলবালার অবস্থা কয়েক দিন ভালর দিকেই গিয়াছিল ; প্রমথ ও তাহার মা রোগীনীর চিকিৎসা এবং সেবার যাহাতে কোন ক্রুটী না হয় সেই নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যয় ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অমিয়াদের দেওঘর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের দিন ষ্টেশনে তাহাদিগকে আনিবার জন্য প্রমথদের যাইবার পর হইতে মাসিমার নিকট কয়েকদিন কোন খবর প্রমথ পায় নাই। তার জন্য প্রমথ একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, "মাসিমা ত কখনও এমন ভাবে খবর না নিয়ে এতদিন থাকেন না," প্রমথ এই কথা বার বার ভাবিতে লাগিল।

"তবে কি মাসিমার মতের বিরুদ্ধে আমরা ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য তিনি রাগ করিয়াছেন, যাই হউক কাকিমাও একটু ভালর দিকে যাইতেছেন আমি কালই দেবগ্রামে যাব, আমাকে দেখিলে মাসিমা সব ভুলিয়া যাইবেন।"

পরদিন প্রমথ মাকে বলিল, "আমি আজ মালদহ যাব, কাকিমার জন্য সিভিল সার্জ্জেন ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে, মামলার তদ্বির ত আছেই, মাসিমার খবর ক'দিন পাইনি।"

মা বলিলেন, "তা যেও বাবা! তবে অমিয়ার মা যদিও একটু ভাল দেখাচ্ছে কিন্তু তার আর বেশী দিন নয়। যত শীঘ্র পার তুমি এস।"

স্নান আহার করিয়া প্রমথ অমিয়াকে কাকীমার সেবার ও ঔষধ সেবনাদির যাবতীয় পরামর্শ দিয়া তার মালদহ যাবার অভিপ্রায় অমিয়াকে জানাইল।

অমিয়া ছল ছল নেত্রে বলিল, "প্রমথদা! মাকে এমন অবস্থায় ফেলে তুমি চলে গেলে আমি কি করে স্থির থাক্‌বো।"

"বিপদের সময় ধৈর্য্য ধরাই বুদ্ধিমতীর কাজ, তুমি ত অবুঝ নও। মালদহ গিয়ে মাসিমাদের যে বিলেত ফেরত ডাঃ বসু আছেন তাকে পাঠিয়ে দেবার আমি ব্যবস্থা করবো এবং প্রত্যহ যাতে সংবাদ পাই তাহারও বন্দোবস্ত করবো— লক্ষ্মীটী, তুমি কেঁদো না।"

প্রমথ অমিয়ার কাঁধে হাত দিয়া এই কথা কয়টী বলিতেই অমিয়া ঝর ঝর নেত্রে কাঁদিয়া উঠিল, প্রমথর স্পর্শে পরক্ষণেই তাহার শরীরে একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তাহার মিনতি-পূর্ণ আঁখি দুটী প্রমথর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সেই মুখ দেখিয়া প্রমথও তাহাদের বাল্যকালের আত্মীয়তা, যৌবনের আকুলতা মনে জাগিয়া উঠিল। তাহাকে নিকটে বসাইয়া স্তোক বাক্য বলিয়া ছল ছল নেত্রে সেখান হইতে বিদায় হইল।

সারাটী পথ অমিয়ার কথাই এবং তাহার সেই করুণ দৃষ্টির বিষয়ই প্রমথর মনে ভরিয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় প্রমথ যখন দেবগ্রামের বাটীতে আসিয়া ছোটমা বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, পট্টবস্ত্র পরিহিতা আলু থালু কেশা সুদৃপ্তনয়না মলিনা দৌড়াইয়া আসিয়া ডাকিল।

"প্রমথদা! আপনি ত আচ্ছা লোক ক'দিনের ভিতর একটা খবর দিলেন না বড়মা ভেবে ভেবে অস্থির, শরীরটা তার খারাপ হয়ে গেছে শীগ্‌রি বড়মার কাছে যান"।

হঠাৎ যেমন বিষধর সর্প দেখিলে মানুষ চঞ্চল হইয়া উঠে তেমনি মলিনার রূপচ্ছটা ও বাক্যবিন্যাস তাহাকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল মুগ্ধ নেত্রে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

"চলুন, ছোটমা কোথায়?"

"বা! বেশত লোক আপনি! আপনি আমায় 'চলুন' বল্‌ছেন আমি আপনার ছোট বোনটী হই।"

"তা বল্লে কি হয়, আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আপনি উচ্চশিক্ষিতা আপনাদের সঙ্গে কি করে কথা কইতে হয় তাত শিখিনি।"

"এ আবার কি, ভাই বোনের সঙ্গে কি করে কথা কইতে হয় একি শিখিয়ে দিতে হবে? এটা আপনার ঠাট্টা না অগ্রাহ্য।"

মলিনার সঙ্গে প্রমথ দ্রুত পদক্ষেপে মাসিমার কাছে উপস্থিত হইল।

প্রমথকে দেখিয়াই স্মৃতিদেবীর বাৎসল্য উথ্‌লিয়া উঠিল। "এসেছিস বাবা", বলে তিনি সজলনেত্রে প্রমথর হাতটী বুকের মাঝে রাখিলেন। প্রমথ মাসিমাকে দেখিয়া একেবারে ছোট শিশুটীর মতই তাহার কোলের কাছে গিয়া বসিল। অনেক কথাবার্ত্তা হইল কিন্তু স্মৃতিদেবী একটীবারও অমিয়া বা অমিয়ার মার কথা বলিলেন না। প্রমথ চিন্তান্বিত হইল এবং ব্যথাও পাইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মাসিমা কেবল মলিনার গুণের কথা, তার ব্যথিত জীবনের কথা, তার শিক্ষাদীক্ষার কথাই প্রমথকে শুনাইতে লাগিলেন।

পরদিন দুপুরে আহারাদির পর যখন স্মৃতিদেবী বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন মলিনা তাহার কাছে বসিয়া বলিল,

"বড়মা! কই আপনি ত প্রমথ দাকে মেয়েদের স্কুলের কথা কিছু বল্লেন না"

"আ পাগ্‌লী! দাঁড়া সে এই সবে এসেছে তার মামলা মাথার উপর ঝুল্‌ছে, আবার কি ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থা ক'রতে হবে একটু স্থির হোক।"

"বড়মা! এখন প্রমথদার কোন কাজ নেই আমি দেখে এসেছি, তুমি এখন তাকে ডাক।"

"প্রমথ কি বাড়ী আছে? তা ডাক্‌তে বল।"

কিয়ৎক্ষণ বাদে প্রমথ আসিয়া মাসিমার নিকট বসিল। স্মৃতিদেবী তখন মলিনার মেয়েস্কুল করিবার সংকল্প তার কাছে ব্যক্ত করিল।

প্রমথ বলিল, "এত খুব ভাল কথা ছোটমা! তবে উনি কি এত কষ্ট কর্ত্তে পার্ব্বেন? আমি ওঁর মত পাশ করা হ'লে আমিও ছেলেদের জন্য একটা স্কুল করতুম।"

মলিনা নালিশের সুরে স্মৃতিদেবীকে বলিল, "দেখুন বড়মা, প্রমথদা যদি আমাকে এরকম করে ঠাট্টা করেন আমি তা হলে একেবারে আড়ি করব।"

"তা তুই 'আড়ি' করগে যা, দাঁড়া আমি তোদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিচ্ছি।"

"তা আপনি কিছুতেই পারবেন না বড়মা।"

সরলা মলিনা এই কথা বলিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। প্রমথর কিন্তু মুখ চোক লাল হইয়া উঠিল তার চিত্ত চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হইল।

কয়েক দিনের মধ্যে প্রমথ ও মলিনার চেষ্টায় বালিকা-বিদ্যালয়টীর কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। মলিনার প্রত্যেক পরিকল্পনা খুঁটিনাটী কাজ প্রমথ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিতে লাগিল। কত সন্ধ্যা স্মৃতিদেবীর বাগানে বসিয়া দুইজনে কতই গল্প করে মনে হয় যেন তারা কতদিনের পরিচিত আপন জন। স্মৃতিদেবীও অলক্ষিতে ইহাদের এরূপ

আলাপ দেখিয়া মনে মনে খুসী হইতেন মনে মনে ভাবিতেন এদের দুজনের মধ্যে যদি মিলন ঘটাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে আমি পরম শান্তি পাই। ভগবান আমার সে ইচ্ছা কবে পূর্ণ করিবেন জানিনা।

পনেরো

এদিকে শান্তিদয়ালের মস্তিষ্ক বিকারের লক্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হাকিম তাঁহাকে রাঁচি উন্মাদ আশ্রমে রাখিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। শৈলবালার অসুখ যদিও কয়েকদিন একটু সুস্থ হইয়াছে, কিন্তু তাহা আরোগ্যর দিকে আর অগ্রসর হইতেছেনা। রমাসুন্দবী শৈলবালার সেবা-চিকিৎসায় মনোযোগ সর্ব্বদাই দিয়া থাকেন। অনেকদিন হইল প্রমথ বাড়ী আসে নাই, তাহাকে দেখিবার জন্য তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন। মলিনার মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ও মামলা তদ্বিরের জন্য, দেবগ্রাম ও মালদহতে তাহাকে থাকিতে হয়, সেইজন্য স্মৃতিদেবী রমাসুন্দরীকে মন্মথকে লইয়া দেবগ্রামে আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

রমাসুন্দরী শৈলবালা ও অমিয়ার থাকিবার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া কয়েকদিনের জন্য দেবগ্রামে আগমন করিলেন। দেবগ্রামে পৌঁছিয়াই দেবালয়ে দেবতার চরণে প্রণাম করিতে গমন করিলেন। মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটী তেজদীপ্ত সরলা কিশোরী পূজার আয়োজন করিতেছে। চারিদিকে পুষ্পরাশি, নৈবেদ্যের পাত্র, ধুপ্ ধুনা শঙ্খ ঘণ্টা ছড়ানো রহিয়াছে। মলিনা আপন মনে পূজার আয়োজন

করিতেছিল। রমাসুন্দরী দূর হইতে মলিনার রূপশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে মলিনাকে ত দেখেন নাই। মনে করিলেন যেন এক দেববালা মন্দিরে আসিয়া দেব সেবায় লিপ্ত। তিনি তন্ময় হইয়া মলিনার দিকে চাহিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ পর ঠাকুর প্রণাম করিয়া রমাসুন্দরী যখন মলিনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, মলিনা তেজোদীপ্ত মহিমমণ্ডিত সুগঠিত রমাসুন্দরীকে দেখিয়া তাহার চিত্তে শ্রদ্ধার উদয় হইল। পরিচয় জানা না থাকিলেও মলিনা গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল।

রমাসুন্দরী মলিনার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "চিরসুখিনী হও মা।"

পরক্ষণেই এত বয়স্কা মেয়ে অবিবাহিত দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাদের মেয়ে গা তুমি ?"

মলিনা বলিল, "এ বাড়ীর গৃহকর্ত্রী স্মৃতিদেবী আমার বড় মা, তার ছেলে প্রমথ আমার দাদা।"

রমাসুন্দরী মলিনার রহস্যময় পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন স্মৃতি কতই না খেলা জানে। প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্মৃতি কোথায় ?"

"তিনি বাড়ির ভিতরে, আসুন তাঁর কাছে নিয়ে যাই।"

রমাসুন্দরী যদিও এ বাটীর একজন, তথাপি তিনি অপরিচিতার মতই মলিনার পিছু পিছু গমন করিলেন।

অন্দরে যাইবা মাত্র স্মৃতিদেবী রমাসুন্দরীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার নিকট আগমন করিয়া প্রণাম করিলেন। রমাসুন্দরী কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর স্মৃতিকে বলিলেন, "এ মেয়েটী কে ? বুঝলাম না ত ?"

স্মৃতিদেবী বলিলেন—"এটী আমার কুড়ানো মেয়ে"—এই বলিয়া মলিনার চিবুক ধরিয়া পুনরায় বলিলেন, "আমার এই মেয়েটিকে তোমায় দেব।"

রমাসুন্দরী স্বভাবতই গম্ভীর প্রকৃতির, তিনি এ কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু কিছুই বলিলেন না অন্য কাজে চলিয়া গেলেন।

স্মৃতিদেবী মলিনার জিজ্ঞাসুনয়ন দেখিয়া বলিলেন, "উনি আমার দিদি, প্রমথর মা।"

মলিনা বলিল, "ও প্রমথদার মা ! বড় মা আমি ওঁকে কি বল্‌বো ?"

স্মৃতিদেবী বলিলেন, "তোকে কি তা শিখিয়ে দিতে হ'বে ?"

মলিনা বলিল, "উনি তা হ'লে ত আমার মাসীমা হন ?"

স্মৃতিদেবী বলিলেন, "তোর যা ইচ্ছা।"

একদিন দুপুরে আহারাদির পর, যখন দুই বোনে নানারূপ সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তা হইতেছিল তখন রমাসুন্দরী স্মৃতিদেবীকে বলিলেন, "আমার ধারণা ছিল যে কলেজে পড়া

মেয়েরা অনাচারী ও অসংসারী কিন্তু মলিনাকে দেখিয়া সে ভুল আমার ভাঙ্গিয়া গিয়েছে।”

স্মৃতিদেবী বলিলেন, “দিদি একটা কথা বল্‌বো যদি তুমি রাখ তা’হলে আমি খুবই শান্তি পাই।”

“কি বলনা তোর সুখের জন্য আমি কি না করতে পারি।”

“আমি বল্‌ছিলাম মলিনার সঙ্গে প্রমথর বিবাহ দিলে হয় না? মলিনার মা যখন মৃত্যু শয্যায় তখন আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে আমার কন্যাস্বরূপ ওকে গ্রহণ করি, এখন যদি প্রমথর সঙ্গে ওর বিবাহ দিয়ে তোমার হাতে অর্পন করতে পারি তাহ’লে আমার ধর্ম্ম রক্ষা করতে পারি—প্রাণে শান্তি পাই।”

“তুই কি পাগল হয়েছিস!. একে ত প্রমথর সঙ্গে ওর মানাবেনা প্রায় সমবয়সী, তায় প্রমথর অপেক্ষাও অনেক বেশী লেখা পড়া জানে; তারপর আমি প্রমথর পাত্রী একরকম ঠিক করে রেখেছি।”

“বেশী পাশ করা না হলেও প্রমথ বুদ্ধিমান, পুরুষ আর মেয়ে অনেক প্রভেদ। হাঁ একটু মেয়েটীর বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু প্রমথর চেয়ে ত দু বৎসরের ছোট, এমন বিবাহ ত অনেক হয়েছে। মলিনার মত রূপে গুণে শিক্ষায় দীক্ষায় ভাল মেয়ে যদি প্রমথর যোগ্য না হ’তে পারে, তাহ’লে এর চেয়ে ভাল মেয়ে আছে বলে মনে হয় না।”

রমাসুন্দরী বলিলেন, "বিবাহ কি কেবল রূপ গুণের উপর নির্ভর করে। আমরা সেকেলে মানুষ তখন একরকম মা-বাপে বিয়ে দিত। প্রমথর সঙ্গে অমিয়ার বিবাহ দেব বলে আমার বাসনা।"

"দিদি তোমার কি এখনও আক্কেল হলোনা, যে তোমায় সর্ব্বস্বান্ত করেছে, যে তোমার পুত্রহন্তা হচ্ছিল, সেই পরম শত্রু নীচ প্রবৃত্তি পিশাচের মেয়ের সঙ্গে তুমি আমার প্রমথর বিবাহ দেবে, এ হোতে পারে না।"

রমাসুন্দরী বলিলেন, "দেখ স্মৃতি! তুমি এখন আমাদের অন্নদাতা তা বলে আমি যতদিন বেঁচে থাক্‌বো ততদিন মুখজ্জ্যে বংশের মর্য্যাদা রাখব। আশ্রিতকে প্রতিপালন করবো সে শত্রুই হউক আর মিত্রই হউক।"

স্মৃতিদেবীর চক্ষু ভার হইয়া উঠিল। সে ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমার ত আত্মজ নয়, জোরই বা কি? তা জানি, তবে তোমার স্নেহগর্ব্বে আমি গরীয়ান এবং প্রমথরই মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় আমি মলিনাকে বধূরূপে বরণ করবার জন্যে তোমার চরণে পুনরায় মিনতি জানাচ্ছি। অমিয়াকে ঘরে এনে প্রমথর মনকে তিক্ত করো না। তুমি কি কদিন লক্ষ্য কর নি, প্রমথর মলিনার প্রতি অনুরাগ?"

রমাসুন্দরী একটু হাসিয়া বলিলেন, "রাগ করো না, তুমি প্রমথর পরম হিতাকাঙ্ক্ষী তা আমি জানি কিন্তু জননী পুত্রের

মনোভাব যেমনটী অনুভব করে তা আর কেউ পারে না, প্রমথ আর অমিয়া বাল্যকাল হতে এক সুত্রে—”

রমাসুন্দরী কথা কয়টী বলিতে গিয়া সামলাইয়া লইলেন। স্মৃতিদেবী রমাসুন্দরীর কথায় ব্যাথিত হইলেন, অভিমানে তার চিত্ত অভিভূত হইল। তখনকার মত এ আলোচনা আর হইল না।

স্মৃতিদেবীর সেই দিন হইতে মনটা যেন সদাই চঞ্চল। রমাসুন্দরীর সম্মুখে উপনীত হইলে তাঁহাকে এড়াইয়া চলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, রমাসুন্দরী বুদ্ধিমতী তিনিও স্মৃতি যে মনে ব্যথা পাইয়াছে তাহার জন্য কুণ্ঠিত, কিন্তু মুখুজ্যে বংশের বধূ কর্ত্তব্য পথ হইতে কখনও বিচলিত হইতে পারে না, ইহাই তাহার ধ্যান ও জ্ঞান। তিনি দেবগ্রামে আর না থাকিয়া সোনাপুরায় চলিয়া গেলেন। অন্যান্য বারের মত শীঘ্র আসিবার অনুরোধ কিন্তু স্মৃতিদেবী এবার করিলেন না।

রমাসুন্দরী সোনারপুরে আসিয়া দেখিলেন অমিয়া ম্লান মুখে ছল ছল নয়নে একাকী বসিয়া আছে। রমাসুন্দরীকে দেখিয়া সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিয়া উঠিল, “মা আর বাঁচবে না, গত রাত্র হতে তিনি পুনঃ পুনঃ অচেতন হয়ে পড়েছেন, আহার একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। আমার কি হবে জেঠাই মা—” এই কথা বলিয়া অমিয়া রমাসুন্দরীর পায়ের কাছে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। রমাসুন্দরী তাহাকে বুকের মাঝে টানিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে

বলিলেন, "ভয় কি মা। আমি যতদিন আছি তোমার কোন ভয় নাই।" একথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

শৈলবালার অবস্থা দিনে দিনেই খারাপ হইতে লাগিল। রমাসুন্দরী প্রমথকে পত্রপাঠ মালদহ হইতে সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। প্রমথ মায়ের পত্র পাইবামাত্র স্মৃতিদেবীর নিকট সব নিবেদন করিলেন। স্মৃতিদেবী কোন কথার জবাব দিলেন না গম্ভীর হইয়া রহিলেন। প্রমথ তাঁর এইরূপ ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ভয়ও পাইলেন। সেখান হইতে সে উঠিয়া যাইয়া এই বিপদের কথা প্রমথ মলিনাকে জানাইল। মলিনা বলিল, "বড়মার হয়ত শরীরটা ভাল নয়।" প্রমথ বলিল, "আমি এখন কি করি ?"

মলিনা, "চলনা বড়মার কাছে যাই।"

প্রমথ ও মলিনা স্মৃতিদেবীর নিকট উপস্থিত হইল। স্মৃতিদেবী তখনও গম্ভীর ও নীরব।

মলিনা বলিল, "বড়মা! প্রমথদা'কে আর তোমাকে মাসিমা সোনারপুরায় যাবার জন্য লিখেছেন, প্রমথদা কি করবে ?"

স্মৃতিদেবী গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "আমি কি ওকে ধরে রেখেছি ? যাক্‌না ওর উপর আমার আর জোর কি ?"

মলিনা মাথা নত করিয়া বলিল, "বড়মা আপনি কি

যাবেন ?" স্মৃতিদেবী মলিনার ব্যথাভরা মুখের দিকে চাহিয়া কোন কথার উত্তর দিতে পারিলেন না নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। প্রমথ কোন কথা না কহিয়া স্মৃতিদেবীর কোলে মাথা রাখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল এবং সে বলিল, "মা আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে তোমার স্নেহের বাঁধন হ'তে আমাকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছো।"

একথা শুনিয়া স্মৃতিদেবী আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, প্রমথকে বুকে টানিয়া বলিলেন, "তোর কি দোষ রে বাবা, তোর আবদার আমাকে রাখতেই হবে বাবা! আমি বাঁধন ছেড়া মানুষ স্নেহই আমাকে বেঁধে রেখেছে, তোর মা যা লিখেছেন তাই হবে।"

প্রমথ স্মৃতিদেবীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "মা চল, কালই আমরা যাই।"

প্রমথ দেবগ্রাম হইতে মালদহ যাইয়া ডাক্তারসাহেব ও ইন্‌জেক্‌সন লইয়া মটরে তৎক্ষণাৎ সোনারপুরায় রওনা হইলেন। প্রমথ ও স্মৃতিদেবী চলিয়া গেল মলিনা দীর্ঘপথ পর্য্যন্ত তাহাদের অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিল, মুখে ভাষা নাই কাষ্ঠপুত্তলিকার মত স্থির দৃষ্টি, একটী দমকা বাতাস আসিয়া তাহার চিত্তকে দোলাইয়া দিল, সে ভাবিল আমি এখানে একা কেন? একবিন্দু জল গণ্ডদেশ বহিয়া পড়িল এবং মনে

মনে ভাবিল কর্ত্তব্যে আমাকে দৃঢ় হইতে হইবে। একি করিতেছি এমন ভ্রম আমার কেন হইল যে আমি আত্মহারা হইয়া পাগলের মত চাহিয়া আছি। মলিনা নিজেকেই কতবার ধিক্কার দিল এবং নিজ কর্ম্ম মনে করিয়াই ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

এদিকে সোনারপুরা গ্রামে ডাক্তারসাহেব রোগীনীকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন বটে কিন্তু প্রমথ যখন তার ফি প্রদান করিল তখন শৈলবালার জীবনের আশা আদৌ নাই ইহা ইঙ্গিতে বলিয়া গেলেন। সমস্ত রাত্র উদ্বিগ্নে ও দুশ্চিন্তায় কাটিতে লাগিল।

প্রদীপ নিবিবার আগে সমস্ত ঘর যেমন পলকের জন্য আলোকিত হইয়া উঠে তেমনি শেষ রাত্রের দিকে শৈলবালার অবস্থা একটু ভাল দেখাইল। শৈলবালা ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন, "দিদি"।

"কি ভাই ছোট বউ" বলিয়া রমাসুন্দরী ও তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। স্মৃতিদেবী শৈলর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

শৈলবালা কহিলেন, "নালিশ জানাবো না কোথায়ও অপরাধীর ক্ষমা হ'ক ঈশ্বরের কাছে, তোমাদের পায়ের ধুলো দাও দিদি।"

"তোর ঘর সংসার ছেলেমেয়ে কার কাছে দিয়ে চল্‌লি ছোট বউ, আমাকে আগে যেতে দিবি না।"

এই বলিয়া রমাসুন্দরী কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং সকলে কাঁদিয়া উঠিল।

রোগীনী কহিল, "মুখুজ্যে বাড়ীর বউ তুমি, তুমি যে সকলের আশ্রয়। দিদি অনুমতি কর অমিকে তোমাদের হাতে দিয়ে যাই। তাঁর কাছ থেকে আমি সেদিন অনুমতি এনেছি তিনিও সুখী হবেন আমিও শান্তি পাব।"

রমাসুন্দরী অমিয়াকে কাছে ডাকিলেন বলিলেন, "ভাবিস্‌নে বোন অমিয়া যে আমারই।"

রমাসুন্দরী প্রমথকে ডাকিলেন, প্রমথ আসিয়া শৈলবালার মাথার কাছে বসিল ও দেখিল কাকীমার চক্ষু ঝাপসা হইয়া আসিতে আর বিলম্ব নাই।

কম্পিত হাতখানা বাড়াইয়া মৃত্যু পথযাত্রীনী শৈলবালা প্রমথর হাতখানা ধরিবার চেষ্টা করিল, প্রমথ ও অমিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রমথ বলিল, "আমাকে কিছু বল্‌ছেন কাকিমা?"

অতি কষ্টে শৈলবালা অমিয়ার হাতখানা লইয়া প্রমথর হাতের উপর দিলেন এবং জড়িত কণ্ঠে সজল নয়নে শৈলবালা বলিলেন, "শেষের অনুরোধ কাকিমার শেষ দান অমিয়াকে তুমি নাও বাবা।"

প্রমথ হতভম্ব হইয়া শুধু মার ও মাসির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, রমাসুন্দরী তাড়াতাড়ি কহিলেন, "ও মায়েরই দান প্রমথ! গ্রহণ কর বাবা।"

প্রমথ আর সহ্য করিতে পারিল না বালকের ন্যায় সে বিদীর্ণ কণ্ঠে কাঁদিয়া কহিল, "যদি কিছু দোষ করে থাকি ক্ষমা করুন কাকিমা!"

অমিয়া ও প্রমথর হাত তুইটী শৈলবালা বুকে রাখিলেন মাত্র, শৈলবালার আর সময় নাই মরণকে বরণ করিতে ব্যস্ত, তাই আর বেশী কথা বলিতে পারিল না। শৈলবালার কণ্ঠরোধ হইল চোখে শুধু অশ্রুর ধারা মাত্র। অমিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া শৈলবালার করুণ চক্ষু তুটী মুদিত হইয়া আসিতে লাগিল।

অমিয়া কাঁদিয়া অধীর হইল—"মা! মা! তুমি চোখ চাও কথা কও তোমার অমিকে চুমু খাও, আমাকে রেখে যেওনা মা।"

অমিয়ার কাতর ক্রন্দনে একবার শৈলবালা চাহিল মুখ নড়িল আর কিছু বলিতে পারিল না। রজনীর শেষ প্রহর ঊষার সন্ধিক্ষণে প্রভাতী পাখীর কলগানের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দীপ নিবিয়া আসিতে লাগিল। স্মৃতি দেবী ও রমাসুন্দরী উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন! অমিয়া মায়ের পায়ে মাথা রাখিল।

প্রমথ শৈলবালার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল-আজ হ'তে সযত্নে গ্রহণ করলুম 'মায়ের দান'।

ফুল ঝরিয়া পড়িল, কান্নার রোল উঠিল।

সমাপ্ত